আল্লামা জামাল আল বাদাবী'র

ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধান

(ইসলামী শিক্ষা কোর্স সিরিজের প্রথম ভল্যুম)

অনুবাদ ঃ ডাঃ আবু খলদুন আল মাহমুদ
শারমিন ইসলাম মাহমুদ

ডঃ আল্লামা জামাল আল বাদাবী'র

ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধান

(ইসলামী শিক্ষা কোর্স সিরিজের প্রথম ভল্যুম)

অনুবাদ
ডাঃ আবু খলদুন আল মাহমুদ
শারমিন ইসলাম মাহমুদ

ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধান

(ইসলামী শিক্ষা কোর্স সিরিজের প্রথম ভল্যুম)

প্রকাশকঃ দি পাইওনিয়ার
১৪৪/১০/বি-৩ শান্তিনগর
ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৪১৬৭৯১, ৮১২০৮৩৮

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০০১ খৃঃ

প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ কেয়ার প্রিন্টার্স (প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং)
১১২/১, ফকিরাপুল, (৩য় তলা) ঢাকা-
ফোনঃ ০১৯-৩৮০৬২২

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মুহাম্মদ ওয়াসীম-বিন-মঈন

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।
U.S. $ 5.00
U.K. £ 3.00

মরহুম ডাঃ জাকির হোসেন ভূঁইয়ার
রুহের মাগফেরাত কামনায়

ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধান

সূচী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দি পাইওনিয়ারের উপদেষ্টার বাণী

ডঃ জামাল বাদাবী একজন সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের প্রচারে, প্রসারে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর "ইসলামী টিচিং কোর্স" বা ইসলামী শিক্ষা কোর্স বক্তৃতামালা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ ধারাবাহিক বক্তৃতামালায় তিনি ইসলামের আকীদা, ইবাদত, নৈতিকতা, সামাজিক বিধান, অর্থনীতি, কুরআন, সুন্নাহ, খৃষ্টবাদ ইত্যাদি প্রত্যেকটি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি তাঁর আলোচনাকে অনেক বক্তৃতায় ভাগ করেছেন। যেমন ইসলামের নৈতিকতার উপর তিনি ৩০টি এবং ইসলামের সামাজিক বিধানের উপর ৪৬টি বক্তৃতা দিয়েছেন।

দি পাইওনিয়ার এর পূর্বে তার বক্তৃতামালার তৃতীয় খণ্ড (জি-সিরিজ) "ইসলামের সামাজিক বিধান" নামে প্রকাশ করেছে। এখন দি পাইওনিয়ার তার বক্তৃতামালার প্রথম খণ্ড (এ- থেকে ই- সিরিজ) প্রকাশ করছে। এ খণ্ডে রয়েছে ইসলামের আকীদা ও মৌল স্তম্ভসমূহ।

ডঃ জামাল বাদাবীর সিরিজটি সামষ্টিক পাঠকের ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী। প্রয়োজনে বক্তৃতার মূল ইংরেজী ক্যাসেটসমূহ The Islamic Information Foundation, 8 Laurel Lane, Halifax, N.S., Canada থেকে অথবা লণ্ডনের কোনো ইসলামী বুকশপ থেকে আনা যেতে পারে।

পূর্বের খণ্ডটির মতো এ খণ্ডটিও অনুবাদ করেছেন ডাঃ আবু খলদুন আল মাহমুদ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (ঢাকা ক্যাম্পাসের) লেকচারার শারমিন ইসলাম। এ নেক কাজের জন্য তারা ধন্যবাদের যোগ্য। আল্লাহ্ তাদের পুরস্কৃত করুন।

অনুবাদটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় আমি 'দি পাইওনিয়ার' এর সকল সদস্যদের মোবারকবাদ জানাই।

শাহ্ আব্দুল হান্নান
উপদেষ্টা
দি পাইওনিয়ার
ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রকাশকদের পক্ষ থেকে

বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই "ইসলামী টিচিং কোর্স" প্রথম ভল্যুম-এর বাংলা অনুবাদ "ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধান" প্রকাশ করতে পেরে। সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। ইতোপূর্বে আমাদেরই প্রকাশিত "ইসলামী টিচিং কোর্স" তৃতীয় ভল্যুমের বাংলা অনুবাদ "ইসলামের সামাজিক বিধান" পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। অগণিত পাঠকের অনুরোধে ও বর্তমান শিক্ষিত সমাজের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শের মৌলিক শিক্ষামূলক জ্ঞান পৌঁছানোর ঐকান্তিক তাগিদ নিয়েই এই বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ নেই। আমরা এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক ডঃ জামাল বাদাবী ও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি "ইসলামী টিচিং কোর্স" বইয়ের সাথে পরিচিত হই 'দি পাইওনিয়ার' এর উপদেষ্টা ও আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব শাহ্ আব্দুল হান্নান-এর মাধ্যমে। তিনি আমাদেরকে বইটি অনুবাদ করে সাধারণ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে সর্বাত্মক সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান করেন। আল্লাহ তাঁরই অনুপ্রেরণায় 'দি পাইওনিয়ার'-এর সাবেক সভাপতি ডাঃ আবু খলদুন আল মাহমুদ এবং 'দি উইটনেস'-এর সদস্যা মিসেস শারমিন ইসলামের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সুন্দর এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ উপহার দেন। এই অনুবাদটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। এই পুস্তকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধানাবলী সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সময়োপযোগী জবাব দিয়েছেন ডঃ জামাল বাদাবী। যা পাঠক সমাজের হৃদয়ে দাগ কাটতে সক্ষম হবে আশা করি।

আমাদের প্রকাশনায় যারা অর্থ দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। আমিন।

ইজাবুল খালিদ
সাধারণ সম্পাদক
দি পাইওনিয়ার
ঢাকা।

বিএম হাবিব
সভাপতি
দি পাইওনিয়ার
ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লেখকের ভূমিকা থেকে

ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সবার বহু জিজ্ঞাসার উত্তর রয়েছে এই সিরিজে। ইসলামী শিক্ষা সিরিজের এই প্রথম ভল্যুমে আলোচিত হয়েছে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ এবং বাইবেল ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উল্লেখ সংক্রান্ত আলোচনা। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এই সিরিজের দ্বিতীয় ভল্যুমে। তৃতীয় ভল্যুমে ইসলামের সামাজিক শিক্ষা আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ ভল্যুমে আলোচিত হবে ইসলামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কুরআনের অলৌকিকত্বের বিষয়ে আলোচনা হবে পঞ্চম ভল্যুমে। এছাড়া পঞ্চম ভল্যুমে একটি বিষয় সূচীও থাকবে।

ইংরেজী বইতে ইংরেজীভাষীদের জন্য ইসলামী শব্দগুলোর পার্শ্বে তার ইংরেজী প্রতিশব্দ দেয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা গ্রুপস্টাডি উভয় ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতেই এই বই ব্যবহার করা যাবে। এই বইটি মূলতঃ অডিও ক্যাসেটের আলোচনারই লিখিত রূপ। কাজেই এই অধ্যয়নের সাথে ক্যাসেট সংগ্রহ করে শুনলে বুঝতে সহজ হবে। বইটি পড়ে যদি কোন অসুবিধা বা অস্পষ্টতা দেখা দেয় তবে মূল ক্যাসেটটি শুনলে আশা করা যায় তা দূর হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুবাদকের ভূমিকা

সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ আল্লামা জামাল আল বাদাবী'র অনুপম উপস্থাপনায় ইসলাম পরিচিতিমূলক গ্রন্থ 'ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধান' অনুবাদ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ইতিপূর্বে লেখকের ইসলামী শিক্ষা কোর্স সিরিজের তৃতীয় ভল্যুম 'ইসলামের সামাজিক বিধান' নামে বাংলায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বই প্রকাশিত হবার পর আমরা বিজ্ঞ পাঠকমহল থেকে ব্যাপক সাড়া পাই। সুধীমহলের পৌনঃপুনিক অনুরোধ ছিল অবিলম্বে তাঁর ইসলামী শিক্ষা কোর্স সিরিজের সকল খন্ড বাংলায় প্রকাশ করা হোক। আমরা আশা করছি, 'ইসলামের সামাজিক বিধান' এর মত এই বইটিও পাঠকদের অনুসন্ধিৎসা পূরণে সহায়ক হবে।

ইসলামী শিক্ষা কোর্স সিরিজের এই প্রথম ভল্যুমে মূলতঃ আলোচিত হয়েছে তাওহীদ, রেসালাত, মুসলমানদের বিশ্বাসসমূহ, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ এবং বাইবেলে রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর উল্লেখ সংক্রান্ত আলোচনা। তাওহীদ, রেসালাত এবং ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আরও বই আছে। কিন্তু এ বইটির আলোচনার বিশেষত্ব হল এই যে, এটি এমন এক জনগোষ্ঠির কাছে প্রশ্নোত্তর আকারে বর্ণিত হয়েছে যারা জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বর্তমান বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের আধুনিক ও যুক্তিবাদী প্রশ্নের জবাব আকারে এসব জানা বিষয়কে নতুন করে জানার সুযোগ পাঠক এ বইতে পাবেন। অন্যদিকে বাইবেল ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর উল্লেখ সংক্রান্ত অধ্যায়টি বাংলাভাষী পাঠকের জন্য এক মূল্যবান প্রাপ্তি হবে বলেই আমরা আশা করছি।

আল্লামা জামাল বাদাবী'র লেখার সাথে আমরা পরিচিত হই বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ ইসলামের উপস্থাপক জনাব শাহ্ আব্দুল হান্নানের মাধ্যমে। তাঁরই অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় এ বইয়ের পূর্ববর্তী খন্ড এবং এটি অনুদিত হয়েছে।

'দি পাইওনিয়ার' এর ভাইয়েরা আগের মত আবারও এ বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের ঋণী করেছেন।

এ অনুবাদ সম্পর্কে পাঠকের যে কোন সংশোধনী, সমালোচনা ও পরামর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

আল্লাহ্ হাফেজ
ডাঃ আবু খলদুন আল মাহমুদ
শারমিন ইসলাম মাহমুদ

এ-১ ইসলাম, মুসলিম এবং দ্বীন

প্রশ্ন- (১) সব মুসলমানই কি আরব অথবা সব আরবই কি মুসলমান ?

প্রশ্ন- (২) ইসলাম কি প্রচলিত অন্যান্য বিশ্বাসের মত কিছু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্ম মাত্র? ইসলামে ধার্মিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ এই দুটো বিষয়ের পৃথক অস্তিত্ব আছে কি?

প্রশ্ন- (৩) ইসলামকে মোহামেডানিজম বললে ভুল হবে কেন?

প্রশ্ন- (৪) ইসলাম এবং মুসলমান শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

প্রশ্ন- (৫) রাসুল (সঃ) এর পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতরাও কি মুসলমান ছিলেন?

প্রশ্ন- (৬) ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ এবং বিশ্বজনীন জীবন বিধান। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের এই বিশ্বজনীনতার কোন গুরুত্ব আছে কি?

উত্তরঃ (১) সকল মুসলিম আরব এবং সকল আরব মুসলিম এই ধারণা প্রসঙ্গে-

ইসলামকে মধ্য প্রাচ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবা বা সকল মুসলমানই আরব অথবা মূলত আরবরাই মুসলমান এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমান বিশ্বে একশত কোটিরও বেশি মুসলমান আছে। তাদের মধ্যে মাত্র ১৫% আরব। ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। তার অনুসারীরা বিশ্বের একশত বিশটিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে সাতান্নটিরও বেশি দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিম সংখ্যালঘু দেশের মাঝে চীনে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন, ভারতে একশত মিলিয়নেরও বেশি মুসলমান আছে।

(মুসলমানদের এই সংখ্যা অনেক পূর্বের। ১৯৯৯ সালে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১৪০কোটি- অনুবাদক)

উত্তরঃ (২) ইসলাম কি অন্যান্য বিশ্বাসের মতই কিছু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্ম মাত্র?

মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পলনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিকসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত। এজন্য ইসলামে ধর্মীয় জীবন ও পার্থিব জীবনে কোন বিভাজন নেই। এখানে সুনির্দিষ্ট ইবাদাতসমূহ ছাড়াও জীবনের সকল কাজই ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই ইসলামকে 'দ্বীন' বলা হয়। যার অর্থ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, নিছক শুধু ধর্ম নয়। নিছক ধর্ম বোঝাতে আরবীতে আলাদা শব্দ 'মিল্লাত' আছে।

উত্তরঃ (৩) ইসলামকে মোহামেডানিজম বলা ভুল কেন?

ইসলাম মোহামেডানিজম নয় বা মুসলমানরাও মোহামেডান নন। এর কারণ নিম্নরূপ-

ক) কুরআন ও হাদীসে এমন নামকরণের পক্ষে কোন ভিত্তি নেই।

খ) আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধানের নাম ইসলাম রেখেছেন। এই নামেই রাসুল (সাঃ) তাঁর মিশন পরিচালনা করেছেন।

গ) মোহামেডানিজম শব্দ থেকে এমন ধারণা তৈরি হতে পারে যে ইসলাম মুহাম্মদ (সাঃ) প্রবর্তিত ধর্ম। এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর খোদায়ী আরোপ করাও

হতে পারে। বাস্তবে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। মুহাম্মদ (সাঃ) সেই জীবন বিধানের প্রচারক।

ঘ) এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও সবার জন্য গ্রহণযোগ্যতাকে নষ্ট করবে। কারণ মুসলমানরা মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়াও আল্লাহ্ প্রেরিত সকল নবী রাসুলকেই বিশ্বাস করেন ও মানেন।

উত্তরঃ (৪) ইসলাম ও মুসলিম-

ইসলাম শব্দের দুটি অর্থ আছে। সালাম অর্থ শান্তি এবং এর আর একটি অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ। ইসলাম এর অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নির্দেশ মান্য করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন। ইসলাম এমন এক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শব্দ যা তার অর্থের ব্যাপকতায় স্থান, কাল ও পাত্রকে অতিক্রম করে। সমাজ ও ব্যষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই মুসলমান। ব্যাপকভাবে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তার নবীদের উপর ঈমান আনা এবং তাদের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান এর আলোকে জীবন পরিচালিত করা।

উত্তরঃ (৫) রাসুল (সঃ) এর পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতরাও মুসলমান ছিলেন-

কুরআন থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামই আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান। সব নবী রাসুলই এই বিধান প্রচার করেছেন এবং পালন করেছেন। কাজেই তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন। বস্তুতঃ মুসলমানরা কোন নতুন ধর্মের অনুসারী নন। বরং সকল নবীরই প্রচারিত ও অনুসৃত ধর্মের অনুসারী। মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে যা পূর্ণতা ও সমাপ্তি পেয়েছে।

উত্তরঃ (৬) ইসলামের বিশ্বজনীনতার গুরুত্ব-

পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের সত্যপন্থী হিসেবে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম হয়েছে। এ ঘোষণার মাধ্যমে এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয় যা গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অন্ধ অনুকরণসহ ধর্মের অন্যান্য ভ্রান্ত উপস্থাপনাকে প্রতিহত করে। যেহেতু ইসলাম মতে সব নবীই ছিলেন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু পৃথিবীতে সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনে এরা সবাই পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন-(৫) আল কুরআন ৩ঃ১৯, ৪৬ঃ১৫, ১০ঃ৭২, ২ঃ১২৮, ১২ঃ১০১, ১০ঃ৮৪, ৩ঃ৫২

এ-২ আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের উৎস

প্রশ্ন- (১) মানুষ তার সীমিত সামর্থ্য ও জ্ঞান দিয়ে কিভাবে আল্লাহকে জানবে?

প্রশ্ন- (২) সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহকে জানার চেষ্টার সাথে জ্ঞানচর্চার কোন বিরোধ আছে কি?

প্রশ্ন- (৩) আল্লাহকে জানার এবং সত্যকে চিনবার জন্য সহজাত অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান চর্চাই কি যথেষ্ট?

প্রশ্ন- (৪) আল্লাহ্ শব্দের অর্থ কি? এই শব্দ কি শুধু মুসলমানদের স্রষ্টার জন্যই সংরক্ষিত নাম?

উত্তরঃ (১) মানুষ কিভাবে আল্লাহকে জানবে?

প্রতিটি মানুষ তার স্রষ্টাকে জানবার এক জন্মগত অনুসিন্ধৎসা নিয়েই তৈরি হয়েছে। এটাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় 'ফিৎরা'। মানুষের অন্তর্নিহিত জন্মগত এই আধ্যাত্মিকতাই তাকে তার স্রষ্টাকে চিনতে অনুপ্রাণিত করে। এটা তার মাঝে সত্য-মিথ্যা, ভাল ও মন্দের পার্থক্য করার মত বিবেক তৈরি করে। এই ফিৎরাতের কারণেই বিপদ, শোক ও প্রয়োজনের সময় আল্লাহর কাছেই মানুষ আশ্রয় চায়। এজন্যেই ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিচিতি দিতে গিয়ে বলতেন "আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন সন্দেহ্ আছে কি"?

উত্তরঃ (২) সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহকে খোঁজার সাথে জ্ঞানচর্চার কোন বিরোধ আছে কি? (Instinctive way of knowing God and the intellectual)

কুরআনে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে বিশ্বাসের সাথে যুক্তির কোন বিরোধ নেই। বরং যুক্তি এবং জ্ঞান বিশ্বাসকেই নিশ্চিত করবে। এজন্যে কুরআন মানুষকে তার চারদিকের সৃষ্টি জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি শৈলীকে অনুধাবন করতে বলে। মানুষের সৃষ্টি, বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য, মহাজগতের সৃষ্টি ও অনুপম পরিচালনা এর সবকিছুই আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রামাণ্য দলিল। কুরআন কখনই বিজ্ঞান ও যুক্তিকে ঈমানের বিরোধী বলে না বরং এসব চর্চার মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শন অনুসন্ধান করতে বলে।

উত্তরঃ (৩) আল্লাহকে চিনবার জন্য অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানচর্চাই কি যথেষ্ট?

শুধুমাত্র সহজাত অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানচর্চা দিয়ে আল্লাহকে চিনতে গেলে মানুষ অনেক সময় ধাধায় পড়তে পারে। কারণ তার অনুসন্ধিৎসা অনেক সময় লোভ ও সামাজিক চাপ দ্বারা ভুল পথে চালিত হতে পারে। মানুষ মানবিক ত্রুটির উর্দ্ধে নয়। বিজ্ঞান অনেক বিষয়ের সমাধান দেয়। কিন্তু দৃষ্টির অগোচরের বিষয় সম্পর্কে যেমন নৈতিকতা, সততা ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান কোন নির্দেশনা দিতে পারে না। আল্লাহর খোদায়ী ক্ষমতা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মৃত্যুর পরের জীবন, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান একমাত্র আল্লাহর ওহীর মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। এসব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

উত্তরঃ (৪) আল্লাহ্ শব্দের অর্থ-

আল্লাহ বলতে সমগ্র মানবজাতির এক এবং একমাত্র প্রভুকেই বোঝায়। আল্লাহ শব্দকে কেবল প্রচলিত 'God' শব্দের সমার্থক ভাবা বা শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রভুর নাম ভাবা ভুল। আল্লাহ নিজে কুরআনে তার এই নাম ঘোষণা করেছেন। মুসলমানরা যখন আল্লাহ্কে ডাকে তখন সমগ্র বিশ্বস্রষ্টাকেই ডাকে। আল্লাহ শব্দের কোন লিঙ্গান্তর বা বহুবচন করা সম্ভব নয়। অতএব বিশ্বস্রষ্টার আল্লাহ নামই বেশি গ্রহণযোগ্য।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৩০ঃ৩০, ১৪ঃ১০, ৯১ঃ৭-৮

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৩০ঃ৮, ২৫ঃ২, ৩৬ঃ৩৬, ৫২ঃ২, ৭ঃ১৮৫, ২ঃ১৬৪

এ-৩ আল্লাহ শব্দের অর্থ ও কালেমার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন- (১) মুসলমানরা যখন আল্লাহকে ডাকে তখন তারা কি সেই সত্তাকেই ডাকে যিনি ইহুদী-খ্রীষ্টানদেরও উপাস্য?

প্রশ্ন- (২) যে সব ইহুদী খ্রীষ্টানের মাতৃভাষা আরবী তারা স্রষ্টার বর্ণনায় কোন শব্দ ব্যবহার করে?

প্রশ্ন- (৩) ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও আরবরা আল্লাহ নামে একজন উপাস্যের পূজা করত। সেই শব্দটিই ইসলামে স্রষ্টার নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে কেউ কেউ দাবী করে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

প্রশ্ন- (৪) ইসলাম গ্রহণের অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা (Testimony) কি?

প্রশ্ন- (৫) না বাচক ঘোষণা দিয়ে কালেমা শুরু হবার কোন বিশেষ তাৎপর্য্য আছে কি?

প্রশ্ন- (৬) তৎকালীন আরব এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে কি ধরনের পূজা প্রচলিত ছিল যার বিপক্ষে কালেমার না বাচক ঘোষণা?

প্রশ্ন- (৭) মানুষের মধ্যে মূর্তি বা পাথরের মতো নিষ্প্রাণ জিনিসের পূজার প্রবণতা কিভাবে জন্ম নিল?

প্রশ্ন- (৮) সূর্য, চাঁদ, বাতাস, গ্রহ নক্ষত্রের মত প্রাকৃতিক বিষয়ের পূজার রীতি প্রচলিত হল কিভাবে?

উত্তরঃ (১) মুসলমানদের আল্লাহ কি ইহুদী- খ্রীষ্টানদের উপাস্য?

মূলতঃ মুসলমানরা যখন 'আল্লাহ' বলে তখন তারা সে সত্তারই কথা বলে যাকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা 'God' বলে। সমগ্র মানব জাতির একজনই স্রষ্টা। কাজেই আল্লাহর নাম উচ্চারণে এমন এক সত্তার নাম উচ্চারিত হয় যিনি সবার স্রষ্টা ও প্রভূ। এমন ভাববার কোন সুযোগ নেই যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের স্রষ্টা বিভিন্ন। সকল মানুষের স্রষ্টা এক আল্লাহ।

উত্তরঃ (২) আরবীভাষী ইহুদী খ্রীষ্টানরা স্রষ্টার নাম উচ্চারণে কোন শব্দ ব্যবহার করে?

আরবীভাষী ইহুদী- খ্রীষ্টানরা স্রষ্টার নাম উচ্চারণে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করে। তার কারণ আরবীতে 'God' এর প্রতিশব্দ 'আল্লাহ'। লেবানন যেখানে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান তিন ধর্মের মানুষই বসবাস করে সেখানে স্রষ্টার নাম উচ্চারণের বিভিন্নতা দিয়ে ধর্মের পার্থক্য করা মুশকিল। কারণ তিন ধর্মের লোকেরাই বিশ্ব স্রষ্টাকে আল্লাহ নামে ডাকে। অবশ্য আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে তিন ধর্মের লোকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন খ্রীষ্টানরা ত্রীত্ববাদে বিশ্বাস করে, যা ইসলাম সমর্থন করে না।

উত্তরঃ (৩) প্রাক- ইসলামী আরবদের মাঝে আল্লাহ শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে-

এই প্রশ্ন এমন একটি ভ্রান্ত অনুমান থেকে উদ্ভূত যে প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে একত্ববাদের কোন ধারণা ছিলনা। বাস্তবে এই অনুমান ঠিক নয়। রাসুল (সাঃ) এর মিশন শুরুর শত শত বৎসর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) আরবের বুকে

একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকেই একক এবং একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর নাম আরবে প্রচলিত। ক্রমে মানুষ ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়। তারা আল্লাহর সাথে আরও অনেক দেবদেবীকে শরীক করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করে। তাদের মধ্যে তখনও আল্লাহ শব্দের ব্যবহার চালু থাকে। তবে তা অন্যতম প্রভূ হিসেবে, একমাত্র প্রভূ হিসেবে নয়। রাসুল (সাঃ) আরবদের মধ্যে সকল কাল্পনিক প্রভূর আনুগত্য বর্জন করে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আনুগত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তরঃ (৪) ইসলাম গ্রহণের অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা-

ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আন্তরিকভাবে যে ঘোষণা দিতে হবে তা হচ্ছে, "আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি কোন প্রভু নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা এবং রাসুল (বার্তাবাহক)"। ইসলাম গ্রহণের জন্য অন্তর থেকে এই ঘোষণাই যথেষ্ট। এর জন্যে কোন মসজিদে যেতে হয় না। কোন যাজকের হাত ধরেও এটা উচ্চারণ করতে হয় না। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ।

উত্তরঃ (৫) না বাচক ঘোষণা দিয়ে কালেমা শুরুর তাৎপর্য্য-

না বাচক ঘোষণা দিয়ে কালেমা শুরু হবার কারণ দুটি-

ক) একমাত্র প্রভূর শ্রেষ্ঠত্ব ও অস্তিত্ব ঘোষণার পূর্বশর্তই হচ্ছে মানুষের মাঝে বিরাজমান আর সব শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার বিলোপ সাধন। এ ঘোষণা দিয়ে মুসলমানরা এটা নিশ্চিত করে যে আল্লাহর সৃষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই খোদায়ীত্ব আরোপ করা যাবে না।

খ) আদম (আঃ) থেকে একত্ববাদের চর্চা শুরু হয়। কালক্রমে মানুষ এই চর্চা থেকে দূরে সরে আসে। কাল্পনিক ও দার্শনিক ভ্রান্তি মানুষকে সত্য-সরল পথে থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশন ছিল ঐসব বিভ্রান্তিকে নাকচ করা এবং মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা।

উত্তরঃ (৬) তৎকালীন আরবদের মাঝে প্রচলিত পূজা ও ধর্মীয় কর্মকান্ড-

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবরা মূলতঃ ছিল মূর্তি পূজারী। তারা পাথর মাটি এবং অন্যান্য দ্রব্য (এমনকি খাদ্যদ্রব্য) দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করত। এসব মূর্তিকেই তারা পূজা করত এদের কাছেই উৎসর্গ করতো। এইসব মূর্তি পূজা যে কতটা অর্থহীন ছিল তার বর্ণনা কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কাহিনীতে জানা যায়। সেখানে দেখা যায় এসব মূর্তি শুধু অন্ধ বধির এবং বোবাই নয় বরং তারা নিজেদের রক্ষা করতেও অক্ষম। ফলে তারা আসলেই উপাসনার অযোগ্য।

উত্তরঃ (৭) মূর্তি পূজার সম্ভাব্য কারণ-

মূর্তি পূজার পেছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ হয়তোবা কোন ভাল এবং মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মীয় বন্ধুরা তার মূর্তি তৈরি করল। পরবর্তীতে প্রজন্মের মানুষরা এই মূর্তিকেই সম্মান করতে গিয়ে শক্তির উৎস মনে করে পূজা শুরু করেছিল। দ্বিতীয়তঃ কেউ এটা ধারণা করতে পারে যে, স্রষ্টার মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করলে তিনি খুশী হবেন। কেউ কেউ এই

মূর্তিকে স্রষ্টা এবং মানুষের মাঝে সেতু বন্ধন হিসেবে মনে করতে পারে। মূর্তি পূজার সর্বশেষ যে সম্ভাব্য কারণটি থাকতে পারে তা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সব সময় তার কল্পনার বিষয়কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটা প্রবণতা কাজ করে। এই প্রবণতা থেকেই মানুষ তার কল্পনার বিমূর্ত স্রষ্টাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে মূর্তিমান করে তুলতে পারে।

উত্তরঃ (৮) প্রাকৃতিক বিষয়কে পূজনীয় বানাবার সম্ভাব্য কারণ-

সর্বোচ্চ সত্তার সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। বিশেষভাবে যে সব প্রাকৃতিক বিষয় মানুষের কল্যাণ বা ক্ষতি করতে পারে সেগুলো নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠতে পারে মানুষ। স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক বিষয়গুলো মানুষের ধরা ছোঁয়ার এবং সীমিত জ্ঞানে অনুভবের বাইরে হওয়ায় তাদের নিয়ে কুসংস্কার তৈরি হবার সুযোগ থাকে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে এভাবে এক সময় মানুষ উপাস্য বানিয়ে ফেলে এবং তাদের কাছে সাহায্য চাইতে থাকে। ইসলামই প্রথম ঘোষণা দেয় যে এ সকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এবং তাঁর অধীন। ইসলাম আরও ঘোষণা দেয় যে এসবকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা বা তাঁর বিকল্প বানানো যাবে না।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ১৯ঃ৪১-৪২, ২৫ঃ৩, ২১ঃ৫১-৬৭

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৬ঃ৭৪-৭৯, ৪১ঃ৩৭

এ-৪ শিরক এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন- (১) বহু ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (২) জরাস্ত্রবাদ (অর্থাৎ ভাল কাজের জন্য একজন এবং খারাপ কাজের জন্য একজন এই দুই স্রষ্টার অস্তিত্ববাদ) সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কি?

প্রশ্ন- (৩) শয়তান, পূজা, যাদু, অতীন্দ্রীয় চর্চা ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৪) পীর পূজা, শাসক পূজা, নবীদের আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করা ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৫) কুরআন যীশু খ্রীষ্টকে কিভাবে চিহ্নিত করে?

উত্তরঃ (১) বহু ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী-

ইসলাম বহু ঈশ্বরবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ কুরআন দ্ব্যার্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, সমগ্র বিশ্ব জগতের স্থিতি ও শৃঙ্খলা একক সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ। সমগ্র জগৎ একক স্রষ্টার একক ইচ্ছায় সৃষ্ট এবং পরিচালিত। যদি কোন ভাবে একাধিক স্রষ্টা থাকত তবে অবশ্যই মহা জগতের অনুপম সুশৃঙ্খল পরিচালন ব্যহত হত। একাধিক স্রষ্টা থাকলে তাদের মধ্যে কলহ, বিবাদ সৃষ্টি হত। বস্তুত বহু ঈশ্বরবাদ একটি অবাস্তব ধারণা।

উত্তরঃ (২) জরাস্ত্রবাদ (দুই খোদা-একজন কল্যাণের এবং একজন মন্দের) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী-

এই ধরনের বহু ঈশ্বরবাদে ভাল কাজের জন্য একজন এবং মন্দ কাজের জন্য একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। এ ধরনের স্রষ্টা সম্পর্কে দুটো ধারণা করা যায় যথা- (ক) দুই স্রষ্টাই সমান শক্তির অধিকারী, (খ) দুই স্রষ্টার মধ্যে একজন অপর জনের চেয়ে বেশি শক্তির অধিকারী। প্রথম ধারণাটি এজন্যে ভুল যে, সমান শক্তির অধিকারী দুইজন পরস্পর বিরোধী স্রষ্টার মধ্যে দ্বন্দ্ব জগতের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করত। দ্বিতীয় ধারণাটি এ জন্যে ভুল যে একজন স্রষ্টা বেশি শক্তিশালী হলে অপরজনকে তার সাপেক্ষে দূর্বল হতে হবে। কিন্তু স্রষ্টাতো কখনও দূর্বল হওয়ার কথা নয়। কাজেই সমগ্র জগতের একজনই স্রষ্টা আছেন এটাই বাস্তবতা।

উত্তরঃ (৩) শয়তান পূজা, যাদু, জ্বীন সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী-

মুসলমানদের শয়তান, ফেরেস্তা, জ্বীন, অধিনশ্বর আত্মা ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়। কিন্তু খোদার ইচ্ছার বাইরে মানুষের কোন কল্যাণ বা ক্ষতি করার কোন স্বাধীন সুযোগ এদের নেই। কাজেই এসবের পূজা করা আল্লাহ্‌র একত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমান। রাসুল (সাঃ) যাদুতে বিশ্বাস করাকে ঈমান বিরোধী কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। যারা এসব অদেখা বিষয়ের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে কুরআন বলেছে।

উত্তরঃ (৪) মানব পূজা প্রসঙ্গে ইসলাম-

মানব পূজা বিভিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে। এগুলো সবই ইসলামের একত্ববাদের বিরোধী। যারা পূর্ব পুরুষের পূজা করে তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে যে, আল্লাহই মানুষকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই একমাত্র আল্লাহই উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। ধার্মিক ব্যক্তির পূজা করাও ইসলাম বিরোধী এমনকি তাঁরা যদি নবী-রাসুলও হন। নবী রাসুলসহ সকল মানুষ আল্লাহরই সৃষ্টি। তাদের কাউকে উপাসনার আসনে স্থান দেয়া যাবেনা।

উত্তরঃ (৫) যীশু সম্পর্কে কুরআন-

ইসলাম মানুষ এবং স্রষ্টার মাঝামাঝি কোন ঐশ্বরিক সৃষ্টির ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ এক এবং একমাত্র। তিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা। কুরআনে অনেক জায়গায় ঈসা (আঃ) এর উল্লেখ এসেছে। কিন্তু সর্বত্র একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঈসা (আঃ) এবং তার মা ছিলেন সাধারণ মানুষ মাত্র। তারা মানুষের মতই খেতেন, রোগ, শোক, বিপদ, জন্ম ও মৃত্যুকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। ঈসা (আঃ) অন্যান্য নবীদের মত নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচয় দিতেন। কাজেই এ ধারণা ভুল যে, তিনি কখনও আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর নিজের উপাসনা করতে মানুষকে বলেছেন। একমাত্র আল্লাহই সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভূ এবং পালনকর্তা। একমাত্র তারই আনুগত্য করতে হবে। কুরআন বলে-

আল্লাহ এক তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন- সবই তাঁর মুখাপেক্ষী।
তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি।
তার সমকক্ষ বা সমতূল্য কেউ নেই। (সুরা-১১২, আল-কুরআন)

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ২১ঃ২১-২২, ২৩ঃ৯১
প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ১৬ঃ৫১-৫২, ১০ঃ১০৮
প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৩৬ঃ৬০, ৬ঃ১৪-১৫, ১০ঃ১৫
প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৪৪ঃ৮, ২৬ঃ২৩-২৬, ২ঃ২১-২২
প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ১১২, ৬ঃ১০১-২, ৫ঃ৭৫-৭৬, ৩ঃ৭৯-৮০

এ-৫ শিরক এবং আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

প্রশ্ন- (১) ইবাদাত ও অন্ধ আনুগত্য বা অনুসরণ এর পার্থক্য কি?
প্রশ্ন- (২) স্বৈরশাসক এর আনুগত্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?
প্রশ্ন- (৩) আত্ম-অহমিকা, গৌরব ও আত্মপূজা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?
প্রশ্ন- (৪) সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?
প্রশ্ন- (৫) আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করুন।
প্রশ্ন- (৬) আল্লাহ্র জাত-গুণ (Essence of God) সম্পর্কে আমাদের সামান্য জ্ঞান দিয়ে কোন আলোচনা বা চিন্তা করা যায় না। আল্লাহ্র গুণবাচক বৈশিষ্ট্য আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করি যেসব গুণ মানুষেরও আছে। (যেমন আল্লাহ দেখেন, শোনেন ইত্যাদি) এক্ষেত্রে এসব গুণ এর আলোচনায় কি সতর্কতা নেয়া উচিৎ?
প্রশ্ন- (৭) বাইবেল মতে আল্লাহ মানুষকে নিজের প্রতিবিম্বে তৈরি করেছেন- এব্যাপারে ইসলামে বক্তব্য কি?
প্রশ্ন- (৮) আল্লাহ্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি?

উত্তরঃ (১) অন্ধ আনুগত্য ও ভ্রান্ত ইবাদাত-

ইসলাম মতে কোন মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে ইবাদাতের জন্য মাথানত করবে না। আল্লাহ ছাড়া কারো অন্ধ আনুগত্য করা যাবে না। কেউ যদি আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী আদেশ করে তবে সে আদেশ মানা যাবে না। এ ধরনের অন্ধ আনুগত্য ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ইবাদাত। আদী ইবনে হাতেম তায়ীকে বর্ণিত হাদীসে রাসুল (সাঃ) এ ধরনের তাওহীদ বিরোধী আনুগত্যের বর্ণনা দিয়েছেন (সূত্র দ্রষ্টব্য)।

উত্তরঃ (২) স্বৈরশাসকের আনুগত্য সম্পর্কে ইসলাম-

আল্লাহ্র বিধি নিষেধ ও ইবাদাতের তোয়াক্কা না করে স্বৈরশাসকের অন্ধ আনুগত্য করা ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক এর সমতুল্য। আল্লাহ্র আনুগত্য করতে অস্বীকারকারী অথবা বিরোধিতাকারী স্বৈরশাসকের আনুগত্য করা মানে তাকে আল্লাহ্র উপরে ক্ষমতাবান মনে করা। কুরআন মতে যেসব শাসক আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করে না তারা জালেম, ফাসেক এবং কাফের। যদিও তারা নিজেদের মুমীন বলে দাবী করে। এদের আনুগত্য করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্যে ইসলামের ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় মুসলমানরা সব সময় স্বৈরশাসন এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। ইসলামে সীজার এর বিষয়ে সীজার এর আনুগত্য আর স্রষ্টার বিষয়ে স্রষ্টার আনুগত্যের কোন সুযোগ নেই। এখানে সবাইকেই আল্লাহ্র আনুগত্য করতে হবে।

উত্তরঃ (৩) আত্ম অহমিকা, গৌরব ও আত্মপূজা প্রসঙ্গে-

প্রকাশ্য আত্মপূজা যা ফেরাউনের মধ্যে দেখা গিয়েছে বা সুপ্ত আত্মপূজা (যেমন ভুল ঠিক নির্বিশেষে নিজের চিন্তাকেই সর্বোচ্চ স্থান দেয়া) দুটোই ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ

আত্মপূজা এক ধরনের শিরক। কারণ তা আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বিদ্রোহের শামিল।

উত্তরঃ (৪) প্যানথেইজম (Pantheism)-

স্রষ্টা তার সৃষ্টির মাঝে বিলিন এই দর্শন একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। কারণ এ থেকে এই ধারণাই তৈরি হয় যে আল্লাহর শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য তার সৃষ্টিকূলের মধ্যেও বর্তমান। এটা তাওহীদবাদ এর বিরুদ্ধে এক চরমপন্থী ধারণা।

উত্তরঃ (৫) (৬) আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা-

আল্লাহ্ সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় কয়েকটি বিষয় সতর্কভাবে খেয়াল রাখা উচিত। প্রথমত আল্লাহর জাত (Essence) ও সিফাত (Attributes) কে পৃথক করা উচিত। মানুষের সীমিত কল্পনাশক্তি ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর জাত সত্তা সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে তাদের পক্ষে আল্লাহর কিছু গুণ উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এসব গুণের আলোচনা ও উপলব্ধির সময় মানবিক শব্দ প্রয়োগে সতর্ক থাকা উচিত। যেমন আল্লাহর জ্ঞান, তার দেখা-শোনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষের এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে চিন্তা করা যাবে না।

সর্বশেষে ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে আল্লাহর কোন দৈহিক অবয়ব চিন্তা করা বা তৈরি করা যাবে না। কারণ এটা হবে তাকে সীমায়িত করার মত ধৃষ্টতা।

উত্তরঃ (৭) বাইবেল বর্ণিত "স্রষ্টা মানুষকে নিজের প্রতিবিম্বে তৈরি করেছেন" এই উক্তি সম্পর্কে ইসলাম-

ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে আল্লাহর কোন অবয়ব নেই। তাঁর অবয়ব থাকলে তিনি তার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তেন। আল্লাহ্ অসীম অশেষ। আল্লাহ্ দেখেন, শুনেন। কিন্তু এসবের জন্য মানুষের মত চোখ, কান এর প্রয়োজন তাঁর নেই। আল্লাহ্ মানুষকে তার প্রতিবিম্বে তৈরি করেছেন এমন ধারণা ভুল এবং বিপদজনক। কারণ এর থেকে মানুষ আল্লাহর প্রতিচ্ছবি, মূর্তি তৈরির চেষ্টা করে। এসব মূর্তিতে শিল্পীর স্থান-কালের প্রতিফলন ঘটে। (যেমন ইউরোপে রেঁনেসার পর গ্রীক-রোমান বৈশিষ্ট্যে একজন সাদা মানুষের রূপে প্রভূর মূর্তি এবং ছবি তৈরি হয়েছিল)। মুসলমানদের জন্য আল্লাহর কোন অবয়ব এর ধারণার প্রয়োজন নেই। তাদের অন্তরে স্রষ্টা আল্লাহর আধ্যাত্মিক ভাবমূর্তি থাকাই যথেষ্ট।

উত্তরঃ (৮) আল্লাহর গুণ (সিফাত) ও বৈশিষ্ট্য-

আল্লাহর প্রথম এবং সবচাইতে বড় গুণ হচ্ছে তিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা এবং এর একক সার্বভৌম প্রভূ। সমগ্র জগতে তাঁর এই প্রভূত্বের কোন অংশীদার নেই।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৯ঃ৩১ এই আয়াত নাযিল হবার পর রাসুল (সাঃ) এর সাহাবী আদী ইবনে হাতেম তায়ী, যিনি খ্রীষ্টবাদ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন, তিনি রাসুলকে বলতে চান যে, খ্রীষ্টানরা তো চার্চের যাজকদের উপাসনা করেনা। তার উত্তরে রাসুল (সাঃ) বলেন যে, এটা কি সত্য নয় যাজকরা নিষিদ্ধ বিষয়কে অনুমোদন দিয়েছেন আবার অনুমোদিত বিষয়কে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৫ঃ৪৭-৫০

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৭৯ঃ২৩-২৪, ২৫ঃ৪৩

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ৪২ঃ১১-১২, ৬ঃ১০৩, সুরা ১১২

প্রশ্ন- (৭) জেনেসিস ১ঃ২৭

প্রশ্ন- (৮) আল কুরআন ৬ঃ১০২, ৭ঃ৫৪, ৪২ঃ১২

এ-৬ আল্লাহর ঐশী গুণাবলী (সিফাত)

প্রশ্ন- (১) আল্লাহ যে সব কিছু সৃষ্টির পূর্বেও বিরাজমান ছিলেন এবং তিনি চিরঞ্জীব এই ধারণা ইসলামে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?

প্রশ্ন- (২) ইহুদী-খ্রীষ্টান মতবাদ অনুসারে প্রভূর বিশ্রাম প্রয়োজন হয় (Sabbath), এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৩) আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সর্বদর্শিতার বিষয়ে ইসলাম কি বলে?

প্রশ্ন- (৪) আল্লাহ কি মানুষের অন্তরের অপ্রকাশিত চিন্তা ও ধারণা সম্পর্কেও জানেন?

প্রশ্ন- (৫) আল্লাহর গায়েবী জ্ঞান (Omnisceince) সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্যের সাথে ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার কোন মিল আছে কি?

প্রশ্ন- (৬) অনেকে বলেন যে, মুসলিম ধ্যান ধারণায় আল্লাহকে উর্দ্ধে স্থান দেয়া হয় যা তাকে সৃষ্টিকূল থেকে দূরে নিয়ে যায়। মানুষ চাইলেই কি আল্লাহকে পেতে পারে?

উত্তরঃ (১) আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং সব কিছু সৃষ্টির পূর্বেও তিনি বিরাজমান ছিলেন-

ইসলাম বলে যখন কিছুই ছিল না তখনও আল্লাহ ছিলেন, যখন কিছুই থাকবে না তখনও আল্লাহ থাকবেন। ইহুদী-খ্রীষ্টবাদেও বলা হয় যে আল্লাহ আলফা এবং ওমেগা অর্থাৎ তিনি শুরুতে ছিলেন এবং শেষে থাকবেন। আল্লাহর এই অসীম সত্তা উপলব্ধি করার জন্য তার সৃষ্টি জগতের বিশালত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। আমাদের জানা সৃষ্টি জগতও আমাদের কল্পনাতীত রকমের বিশাল অসীম। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন– পৃথিবী থেকে দূরতম নক্ষত্রের দূরত্ব দুই হাজার মিলিয়ন আলোক বর্ষ। অর্থাৎ উক্ত নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে দুই হাজার মিলিয়ন বছর লাগবে। (আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল) সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় দেড় সেকেন্ড। এমন জগতের স্রষ্টা কত অসীম এবং বিশাল। মানুষের কল্পনা শক্তি তার অসীমত্ব বিবেচনায় অক্ষম। তিনি চিরঞ্জীব, আদি ও অন্ত। কুরআনের প্রখ্যাত আয়াত আয়তুল কুরসী থেকে আল্লাহর ৭টি ঐশ্বরিক গুণ এর কথা জানা যায়। যথাঃ

(ক) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই।

(খ) তিনি চিরঞ্জীব (The Everliving)।

(গ) তিনি সর্বকাল ধরে অবস্থানরত (The Eternal)।

(ঘ) তিনি সকল জ্ঞানের আধার।

(ঙ) পৃথিবী থেকে শুরু করে সারা সৃষ্টি জগতে তার শক্তি, ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব ও সিংহাসনের বিস্তৃতি।

(চ) তার অনুমোদন ছাড়া কিছুই সংগঠিত হতে পারে না।

(ছ) কোন মানবিক দূর্বলতা তাকে স্পর্শ করে না।

উত্তরঃ (২) ইহুদী-খ্রীষ্টান মতবাদ অনুসারে স্রষ্টার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী-

খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বলে যে, ছয়দিন ধরে জগৎ সৃষ্টির পর সপ্তম দিন স্রষ্টা বিশ্রাম নেন। ইসলামে এমন ধারণার কোন স্বীকৃতি নেই। কুরআন বলে যে কোন মানবিক দূর্বলতা (যেমন ক্লান্তি, তন্দ্রা) ইত্যাদি আল্লাহকে স্পর্শ করে না। তাকে মানুষের মত হাতে ধরে কিছু তৈরি করতেও হয় না। যখনই তিনি কিছু তৈরির সিদ্ধান্ত নেন তখন 'কুন' (হয়ে যাও) বলা মাত্রই তা তৈরি হয়ে যায়। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বেহেশতের বাগানে আল্লাহকে পায়চারীরত দেখেন এবং তার কণ্ঠ শুনেন। এসব উদ্ধৃতিরও কোন ভিত্তি ইসলামে নেই। ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মত কোন বিশ্রাম দিবস/পবিত্র দিবস (Sabbath) মুসলমানদের নেই। শুক্রবার মুসলমানদের বিশেষ জামায়াতে নামাজের দিন। নামাজের পর স্বাভাবিক কাজকর্মে মুসলমানরা ফিরে যান।

উত্তরঃ (৩) আল্লাহ্‌র জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা-

কুরআনের অনেক জায়গাতেই আল্লাহর জ্ঞান এর অসীমত্ব সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে "তাঁর কাছে আছে সব অদেখা জগতের চাবি। তিনি ছাড়া কেউ তার খবর রাখেন না। ভূমিতে এবং সমুদ্রে কি আছে তা তিনি জানেন। তার অজ্ঞাতে একটি গাছের পাতাও পড়ে না। পৃথিবীর কোন অন্ধকার স্থলেও তার অজ্ঞাতে কোন বীজ অঙ্কুরীত হয় না। তার অজান্তে কোন মাটি সিক্ত বা শুকনো হয় না। এসবই স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়।" (আল কুরআন ৬ঃ৫৯)

উত্তরঃ (৪) দেখা- অদেখা সব বিষয়ে আল্লাহ্ জ্ঞাত-

আল্লাহর জ্ঞান হচ্ছে অসীম, চূড়ান্ত এবং নির্ভুল। তিনি প্রকাশিত-অপ্রকাশিত, দেখা-অদেখা সব বিষয়ে অবহিত। মানুষ গোপনে যা পরামর্শ করে তাও আল্লাহ দেখেন ও জানেন। মানুষের মনের ভেতর কি চিন্তা আছে তা সে অন্যের কাছে প্রকাশ না করলেও আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকে না।

উত্তরঃ (৫) ইসলামে বর্ণিত আল্লাহর গায়েবী জ্ঞান এর সাথে ইহুদী-খ্রীষ্টান বর্ণনার তুলনা-

আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার সাথে বাইবেল, ইনজিলের বর্ণনার কিছু মিল আছে। তবে এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা অনেক স্পষ্ট, অভ্রান্ত। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে যে বাবেল টাওয়ার (Tower of Babel) নির্মাণের মত জ্ঞান ও কলা কৌশল যে মানুষ আয়ত্ব করতে পারবে তা স্রষ্টার জানা ছিল না। যখন মানুষ এ কাজ করে ফেলল তখন স্রষ্টা শঙ্কিত হলেন যে মানুষ আরও ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি মানুষকে বিভিন্ন ভাষা জাতিতে বিভক্ত করে দিলেন যাতে তারা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করতে না পারে এবং বিভ্রান্তিতে পড়ে।
অন্যদিকে ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেয় যে আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা হচ্ছে চূড়ান্ত। মানুষের কোন কাজেই তার আশ্চর্য বা শঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। বাইবেল আরও বলে যে শয়তানকে তৈরির জন্য স্রষ্টা অনুতাপ করেন। কিন্তু কুরআন বলে যে, আল্লাহ ভ্রান্তির উর্দ্ধে। ভুল শুধু মানুষেরই হতে পারে। তাদের অনুতাপের প্রশ্ন আসে। ইসলাম আরও বলে যে আল্লাহ মানুষের

সব বিষয়ে অবহিত কাজেই মানুষের অবস্থা দেখবার জন্য অবতাররূপে তার পৃথিবীতে আসবার প্রয়োজন নেই।

উত্তরঃ (৬) আল্লাহকে পাবার উপায়-

পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, মুসলমানদের স্রষ্টা অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করেন তিনি বান্দার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বাস্তবে এটা ঠিক নয়। আল্লাহ সব সময় সর্বত্র ব্যপ্ত। তিনি সকল মানুষের প্রভূ এবং আপন। কুরআনের একটি বাদে সকল সুরা শুরু হয়েছে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে। এখানে আল্লাহর দুটো নাম উচ্চারিত হয়েছে 'রাহমান' ও 'রাহিম' (দয়াময়, অনন্ত দাতা)। এই শব্দ দুটোর ব্যাপক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 'রাহিম' (দয়ার গুণ) অন্যকারো মধ্যেও থাকতে পারে কিন্তু 'রাহমান' একমাত্র আল্লারই। অর্থাৎ তিনি সকল দয়া ও ক্ষমার ভান্ডার।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৫৭:৩, ২৫:৫৮, ২৮:৮৮, ৫৫:২৭-২৮, ২:২৫৫
প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ২:২, ৩:৮, ৫:৩৮, ৩২:৪
প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৩:৫-৬, ৩১:৩৪, ৬:৫৯
প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৫৮:৭, ৬৭:১৩, ১৩:১৪
প্রশ্ন- (৫) জেনেসিস ১১:৫-৭, Exod ৩২:১৪
প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ৭:১৫৬

এ-৭ আল্লাহর ঐশী গুণাবলী

প্রশ্ন- (১) মানুষ যখন বিপদে বা প্রয়োজনে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ্ কতটা নিকটে থাকেন?

প্রশ্ন- (২) আল্লাহর ক্ষমার গুণের আলোকে ইসলাম মানুষের আদি পাপকে (Original sin) কিভাবে বিবেচনা করে?

প্রশ্ন- (৩) যদি আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) কে আল্লাহ্ ক্ষমাই করেন তবে তাদের পৃথিবীতে পাঠাবার কারণ কি?

প্রশ্ন- (৪) ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কোন পাপ করলে তওবা করার ব্যবস্থা কি?

উত্তরঃ (১) আল্লাহ্ অত্যন্ত কাছে-

ইসলামে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশালত্ব ঘোষণার মানে এই নয় যে, আল্লাহ বান্দা থেকে দূরে থাকেন। কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ বান্দার শুধু কাছেরই নন বরং তার সবচাইতে আপন ও দয়াবান বন্ধু। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা বান্দার সাথে আল্লাহর সরাসরি সম্পর্কের কথা বলে। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী বা যাজকের প্রয়োজন ইসলামে নেই। আর কোন ধর্মে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির এমন সরাসরি সম্পর্কের স্বীকৃতি নেই।

উত্তরঃ (২) আদি পাপের (Original sin) ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী-

খ্রীষ্টবাদ মতে আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ) নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আদি পাপ করেছিলেন। এই পাপের বোঝা মানুষকে আজন্ম বইতে হবে। যা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় যীশুখ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা মনে করা। ইসলাম বলে যে, মানুষ পাপ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার কোন আদি পাপ নেই। ইসলামে আদি পাপের ধারণা প্রত্যাখ্যাত হবার পেছনে পাঁচটি প্রধান যুক্তি-

(ক) আল্লাহ্ জানেন যে মানুষ পাপে আক্রান্ত হতে পারে। কারণ মানুষ বস্তু এবং আধ্যাত্মিক উভয় উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি। সর্বজ্ঞাত ন্যায়ের প্রতীক আল্লাহর পক্ষে এটা অসম্ভব যে প্রথম মানব মানবীর ভুলের জন্য সমগ্র মানব জাতিকে তিনি পাপী সাব্যস্ত করবেন।

(খ) কুরআন মতে আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ) উভয়ে ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। কাজেই ক্ষমা প্রাপ্ত বিষয়ে পাপের বোঝা টানার প্রশ্ন অবান্তর।

(গ) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও ন্যায়বান। তার পক্ষে এটা অসম্ভব যে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) ক্ষমা চাইবার পরও তাদের ক্ষমা করবেন না বরং তাদের সকল বংশধরদের উপর এই পাপের দায়ভার চাপিয়ে দেবেন।

(ঘ) আল্লাহ আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)কে ক্ষমা করার পরই পৃথিবীতে পাঠান। কাজেই তাদের বংশধরদের তথাকথিত আদি পাপের বোঝা বহনের আর কোন দায়ভার নাই।

(ঙ) আল্লাহ একজনের পাপের জন্য আর একজনকে কখনও দোষী সাব্যস্ত করেন না। তিনি বলেন, "........ একের বোঝা অপরের উপর চাপানো হবে না।"

উত্তরঃ (৩) আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ)কে কি ভুলের শাস্তি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল?

কুরআন মতে আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ)কে কোন ভুলের শাস্তি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি। বরং কুরআনে দেখা যায় আল্লাহ আদম (আঃ)কে তৈরির আগেই ফেরেশতাদের বলেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) প্রেরণ করবেন। আদম (আঃ) পৃথিবীতে আল্লাহর প্রথম খলিফা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সৃষ্টির পর পরই তাঁদের কেন পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি। এর কারণ সম্ভবতঃ আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠাবার আগে বেহেশতে রেখে তাদের সবকিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

উত্তরঃ (৪) ইসলামে তওবার বিধান-

ইসলামে ভুল বা পাপের জন্য তওবা (অনুতাপ) অত্যন্ত সহজ এবং সরল পথ। এর চারটি দিক আছে-

(ক) পাপের কাজ আন্তরিকভাবে বন্ধ রাখতে হবে অথবা অন্ততঃ তা বন্ধের দৃঢ় ইচ্ছা রাখতে হবে।

(খ) পাপ বা ভুলের জন্য তীব্র অনুতাপ বোধ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

(গ) ঐ পাপ বা ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে।

(ঘ) যদি ঐ পাপের সাথে কারো অধিকার ছিনিয়ে নেবার ঘটনা জড়িত থাকে তবে তওবার পূর্বেই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। (যেমন কারো সম্পদ আত্মসাৎ বা চুরি করা হলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে)

একমাত্র আল্লাহই ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। তাই তার কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে। ইসলামে অন্য ধর্মের মত কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৫০ঃ১৬

এক বেদুইন রাসুল (সাঃ) এর কাছে এসে জানতে চান যে, আল্লাহ কি এত কাছে যে তার সাথে একান্ত বিষয় আলাপ করা যায় নাকি খুব দূরে যে চিৎকার করে তাকে কথা শোনাতে হয়। তখন এই প্রশ্নের জবাবে দ্বিতীয় সুরার ১৮৬ নং আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষের অতি কাছে।

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৭ঃ২২, ২ঃ৩৭, ৫৩ঃ৩৮

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ২ঃ৩০ হাদীসে রাসুল (সাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক নবজাত শিশু নিষ্পাপ এবং খাঁটি।

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ১৫ঃ৪৯-৫০, ১১ঃ১১৪, ৩৯ঃ৫৩-৫৪, ৩ঃ১৩৫, ২০ঃ৮২

এসবই আল্লাহর অধীন এবং তিনি মানুষের কল্যাণের জন্যেই এদের সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তাঁর সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুধাবন করবে এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে নিজেকে এবং পৃথিবীকে পরিচালিত করবে।

উত্তরঃ (৫) আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রভাব-

প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয়ের উপর আল্লাহর জ্ঞান থাকার ব্যাপারে অবহিত হওয়ার কারণে বিশ্বাসীরা যে কোন খারাপ কাজ থেকে নিজেদের দূরে রাখে। আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস এই ভাবে তাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করবে। এ ভাবে ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজ পরিশুদ্ধ হবে। বিশ্বাসীরা সব সময়ই তাদের চিন্তা, কথা ও কাজ দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চাইবে। অন্যদিকে অবিশ্বাসীরা সামাজিক চাপে অথবা বস্তুগত লাভের জন্যে নৈতিক আচরণ করে থাকে। আল্লাহর সঠিক প্রজ্ঞায় বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর আদেশাবলী বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন আল্লাহর শিক্ষাই বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হয়।

উত্তরঃ (৬) আল্লাহর ক্ষমাশীলতা-

আল্লাহর ক্ষমাশীলতার কারণে মানুষ তথাকথিত আদি পাপের দায় থেকে মুক্ত হয়। ধর্মের নামে এক শ্রেণীর যাজক বা গুরুর প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়। কারণ আল্লাহর এ ক্ষমাশীলতার সুযোগ নেবার জন্যে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর এই গুণের কারণে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কাজ ও দায়িত্বের ব্যাপারে আরও যত্নবান হয়। কারণ তাকে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় চলেই তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা অর্জন করতে হয়।

উত্তরঃ (৭) আল্লাহর দয়া-

মানুষ তাকে দেয়া আল্লাহর সকল দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য তার শোকর করবে। বস্তুতঃ আলো বাতাস পানি থেকে শুরু করে জীবনের সব কিছুই মানুষ আল্লাহর দয়াতেই লাভ করে। আল্লাহর এই দয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে মানুষের মধ্যে নিশ্চিন্ততাবোধ (Sense of Security) আসে। কারণ সে জানে যে আল্লাহ তার সব বিপদ-আপদ মোকাবেলার ব্যবস্থা রেখেছেন।

উত্তরঃ (৮) আল্লাহর চূড়ান্ত এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা-

আল্লাহর এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার কারণে মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করে না। এ কারণেই ইতিহাসে দেখা যায় মুসলমানরা সব সময় অন্যায় অবিচার জুলুম স্বৈরশাসনকে রুখে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কিছুই হতে পারে না। এই অনুভূতি মানুষের মনের অহেতুক ভয়-ভীতি দূর করে। মানুষ তার হাতে ক্ষমতা আসলেও সে ক্ষমতার দাপটে অন্ধ হয় না বরং সে আরও বিনয়ী হয়। কারণ আল্লাহই তাকে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য, সম্পদ, সম্মান দিয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলেই তা কেড়ে নিতে পারেন। আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতার নীচে সব মানুষ সমান। এই বোধ মানুষকে সব কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করতে অনুপ্রাণিত করে।

এ-৮ একত্ববাদে বিশ্বাসের বাস্তব প্রয়োগ

প্রশ্ন- (১) যারা বলে যে, 'ইসলাম খুবই সোজা (Simplistic) এবং অশিক্ষিত বেদুইনের জন্যই প্রযোজ্য' তাদের সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

প্রশ্ন- (২) কালেমায় বিশ্বাস কি মুসলমানদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে?

প্রশ্ন- (৩) আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের বাস্তবে কি কি প্রয়োগ দেখা যায়?

প্রশ্ন- (৪) আল্লাহর একত্বের (Uniqueness) বিশ্বাসের বাস্তবে কি প্রয়োগ দেখা যায়?

প্রশ্ন- (৫) আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করার কি সুফল আমরা দেখি?

প্রশ্ন- (৬) আল্লাহর ক্ষমাশীলতার কোন কোন সুফল আমরা ভোগ করি?

প্রশ্ন- (৭) আল্লাহর দয়ার কি প্রভাব মানবজাতির উপর পড়ে?

প্রশ্ন- (৮) সকল বিষয়ের উপর আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবার কি প্রভাব মানুষের উপর আসে?

প্রশ্ন- (৯) আল্লাহর নৈকট্যের কি সুফল বা প্রভাব আমাদের উপর পড়ে?

উত্তরঃ (১) ইসলাম একটি সহজ পদ্ধতি নাকি অতি সাধারণ (Simplistic)?

আধুনিকতার জটিল মারপ্যাঁচ নিয়ে গবেষণায় ক্লান্ত পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবিরা যখন ইসলামের একত্ববাদের সরল-সুন্দর রূপ দেখেন তখন প্রথমতঃ এটাকে খুবই সোজা এবং অতি সাধারণ বিধান যা বর্বর মূর্তিপূজারী বেদুইনের মুক্তির জন্যই প্রযোজ্য বলেই চিহ্নিত করতে চান। অথচ বাস্তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত সত্যই সরলতার সাথে গভীরতাকে সম্পৃক্ত করেছে। কাজেই কোন বিষয় সহজ হলেই অতি সাধারণ হবে এমন ধারণা করা ঠিক নয়। ইসলামের বিশ্বাসকে যেমন একাধারে এক খোদায় বিশ্বাসে সংক্ষেপিত করা যায় আবার সেই খোদার অস্তিত্ব, অবদান ও প্রভাবের ব্যাখ্যাও তেমনি বিশাল।

উত্তরঃ (২) (৩) আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োগ-

আল্লাহর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বাস্তব সুফল মানুষ তথা বিশ্বাসীরা ভোগ করেন। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস থেকেই মানুষের মাঝে একত্বের অনুভূতি জাগে। জাতি বর্ণ গোত্র ভাষা নির্বিশেষে সব মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর বান্দা। কাজেই সবার অধিকার ও মর্যাদা সমান। ইসলামে এ ধারণা প্রচারের সুযোগ নেই যে আমার প্রভূ বা তোমার প্রভূ, বরং ইসলাম সব মানুষকে বলে আল্লাহকে ডাকতে আমাদের প্রভু হিসেবে।

মানুষের মাঝে ছোট বড় ভেদ করার কুসংস্কার দূর করে একত্ববাদ। এটা আরো শিক্ষা দেয় যে, সমগ্র মানবগোষ্ঠী এক জাতি। একই শিক্ষা নিয়ে নবী-রাসুলগণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এসেছিলেন। তারা সবাই একই দ্বীনে বিশ্বাসী এবং ভাই। কাজেই সব নবীর অনুসারীরাই ভাই। রাসুল (সাঃ) এর আগমন এই আদি দ্বীনকে পূর্ণতা ও সমাপ্তি দেবার জন্যই।

উত্তরঃ (৪) আল্লাহর একত্বের (Uniqueness) বিশ্বাসের প্রয়োগ-

সমগ্র জগতের উপর আল্লাহর একক সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস মানুষকে আরও সাহসী করে। মানুষকে এই ধারণা দেয় যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রসহ সমগ্র প্রকৃতিকে ভয় করার কিছুই নেই।

বি-১ রিসালাত এবং ওহীর প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন- (১) তাওহীদের সাথে রিসালাতের সম্পর্ক কি?
প্রশ্ন- (২) সঠিক পথ চলার জন্য মানুষের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাধনা যথেষ্ট নয় কেন? এ জন্য নবী রাসূলের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?
প্রশ্ন- (৩) ব্যক্তিগত ধ্যান সাধনার (Meditation) মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়া কি সম্ভব?
প্রশ্ন- (৪) ওহী বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ (১) তাওহীদ ও রিসালাতের সম্পর্ক-

ইসলামের মূল কালেমায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহর উপর বিশ্বাস থেকেই এই রিসালাতের বিশ্বাস উদ্ভূত হয়। কারণ আল্লাহর বাণী ও নির্দেশনা কোন মানুষের মাধ্যমেই আমাদের কাছে আসতে হবে। যারা আমাদের কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করবেন এবং তাঁর নির্দেশনা আমাদের অবহিত করবেন। কালেমায় আল্লাহর বিশ্বাসের সাথে রাসুলের উপর বিশ্বাস আনার কথা বলা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, শুধু মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর বিশ্বাস আনলেই চলবে। বরং আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী রাসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কুরআন এবং হাদীস এই শিক্ষাই দেয়।
আল্লাহর একত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর সৃষ্টির বিশালত্ব এটাই নিশ্চিত করে যে, এই জগৎ ও মানব সমাজ আল্লাহ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করেছেন এবং সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পন্থা তিনি নবী রাসুলদের মাধ্যমে মানুষকে অবহিত করেন।

উত্তরঃ (২) নবী-রাসুলের আগমন প্রয়োজন কেন?

চারটি প্রধান কারণে বিজ্ঞান মানুষকে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা দিতে অক্ষম। যে জন্যে নবী রাসুলের মাধ্যমে ওহীর জ্ঞান আবশ্যক।

(ক) যদিও বিজ্ঞান জ্ঞানের এক বিশাল উৎস। তবুও তা মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির ফসল।
(খ) বিজ্ঞান জীবনের আংশিক ব্যাখ্যাই দিতে পারে।
(গ) মানব জন্মের উদ্দেশ্য, মানুষের মাঝে নৈতিক, মানবিক শিক্ষার বিষয়ে বা মানুষ দুনিয়াতে কিভাবে চলবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞান কোন নির্দেশনা দিতে পারে না।
(ঘ) মানুষের সার্বিক প্রকৃতি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বিজ্ঞান কোন ধারণা করতে পারে না। ফলে এটা মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে কোন জীবন বিধান দিতে অক্ষম। একমাত্র আল্লাহই মানুষের মনের খবর রাখেন। কাজেই তাদের সুখী করবার বিধান তিনিই দিতে পারেন।

উত্তরঃ (৩) ধ্যান-সাধনা (Meditation) প্রসঙ্গে-

'ধ্যান' করা (Meditation) কখনই ওহীর বিকল্প হতে পারে না। কারণ-

উত্তরঃ (৯) আল্লাহ্‌র নৈকট্য-

কুরআন বলে যে, আল্লাহ্ মানুষের 'জুগুলার শিরা'র (jugular vein) চেয়েও নিকটে অবস্থান করেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে পারে। তার ইবাদাতের মাধ্যমেই এই নৈকট্য অর্জন সম্ভব। এই নৈকট্যের জন্য বিশ্বাসীদের অন্তর এবং হৃদয়ে অনাবিল প্রশান্তি বিরাজ করে।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৪৭ঃ১২

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ৮২ঃ১৯

প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ৩৯ঃ৫৩, ১২ঃ৮৭

প্রশ্ন- (৯) আল কুরআন ৬৪ঃ১১, ২ঃ২৫৭, ৪৮ঃ৪, ১৩ঃ২৮

(ক) এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশেষ, এর মাধ্যমে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

(খ) 'ধ্যান' এর মাধ্যমে একজনের প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরে পুরো সমাজ নিঃসন্দেহে আস্থা রাখতে পারে না।

(গ) 'ধ্যান' একটি নিষ্ক্রীয় প্রক্রিয়া। এটা সাধারণত ব্যক্তিকে স্বার্থপর করে তুলে। ধ্যানকারী এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন অথবা সাধারণ জনগণের উপরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী থাকেন।

আল্লাহ্ হচ্ছেন একক এবং সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁকে শুধুমাত্র সম্মান করা ও ভালবাসার মাধ্যমে মানুষ তাঁর প্রতি কর্তব্য শেষ করতে পারেনা। এই জন্য প্রয়োজন তাঁর আদেশ নিষেধের প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পণ। একমাত্র অহির মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁর আদেশ নিষেধ পাওয়া যায়।

উত্তরঃ (৪) ওহীর অর্থ-

ওহী হচ্ছে আল্লাহর বাণী যা তিনি তাঁর নবীর কাছে সাধারণত জিবরাইল (আঃ) ফেরেস্তার মাধ্যমে প্রেরণ করেন। নবীগণ আল্লাহর ওহী জনগণের কাছে পৌঁছে দেন। যেহেতু ওহী সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আসে সেহেতু এর সত্যতা এবং যথার্থতার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এটা এমন জ্ঞান প্রদান করে যা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান সাধনা করে অর্জন করতে পারে না। নবী মনোনীত করেন স্বয়ং আল্লাহ। কেউ স্বেচ্ছায় নবী হয়ে যেতে পারেনা। ফলে নবুওয়তের নামে মানুষের নিজের কথাকে কেউ আল্লাহর বাণী হিসেবে চালিয়ে দিতে পারেনা। মেডিটেশন বা ধ্যানের নামে অসৎ ও স্বার্থবাদী ব্যক্তিরা নিজেদের কথাকেই আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিতে পারে।

ওহীর মাধ্যমে নবীরা সমাজ ও জনগণকে পরিচালনার নির্দেশ পান। তাছাড়া অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা ও পথ নির্দেশ লাভ করেন।

কুরআনের মতে ওহী প্রেরণের তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা-

(ক) অনুপ্রেরণা।

(খ) বিশেষ পদ্ধতিতে সরাসরি রাসুলের সাথে আল্লাহর সংলাপ।

(গ) জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রেরণ।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৪ঃ৬৪, ৫ঃ৭০

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৪২ঃ৫১-৫২, ২২ঃ৭৫, ৪ঃ১৬৩

বি-২ ওহী এবং নবুওয়তের প্রয়োজন

প্রশ্ন- (১) জিবরাইল (আঃ) কি কি বেশে নবীগণের কাছে আসতেন?

প্রশ্ন- (২) জিবরাইল (আঃ) কি সাহাবাগণের সামনে কখনও রাসুলের কাছে এসেছিলেন?

প্রশ্ন- (৩) কেউ কেউ বলেন রাসুল (সাঃ) ওহী নাযিলের সময় প্রকৃতপক্ষে মৃগী রোগে (Epliepsy) ভুগতেন এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

প্রশ্ন- (৪) ওহী কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া হলো কেন?

প্রশ্ন- (৫) মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ রাসুল কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর ওহী নাযিলের পথ কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

প্রশ্ন- (৬) ইসলাম মতে নবী কারা?

প্রশ্ন- (৭) নবীগণ কি মানুষ ছিলেন?

উত্তরঃ (১) জিবরাইল (আঃ) কোন বেশে আসতেন?

জিবরাইল (আঃ) প্রথম রাসুল (সাঃ) এর কাছে আসেন হেরা গুহায়। তাঁর আনা প্রথম বাণী ছিল- "পড় তোমার প্রভুর নামে" (৯৬ঃ১)। এরপর সুদীর্ঘ ২৩ বছর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বেশে জিবরাইল (আঃ) রাসুলের কাছে বাণী নিয়ে আসতেন। প্রধানতঃ দুইভাবে জিবরাইল (আঃ) আসতেন। কখনো কখনো অন্যান্য সাহাবার উপস্থিতিতে মানুষের বেশে তিনি আসতেন। আবার কখনো অদৃশ্যভাবে আসতেন। শুধুমাত্র রাসুল (সাঃ) তাঁর উপস্থিতি টের পেতেন।

উত্তরঃ (২) জিবরাইল (আঃ) এর সাহাবাদের সামনে আগমন-

একবার রাসুল (সাঃ) সাহাবাদের নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন। তখন জিবরাইল (আঃ) আসেন। তিনি রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। সাহাবারা দেখেন যে একজন অচেনা মানুষ রাসুল (সাঃ)-এর কাছে এসে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর রাসুল তাঁর পরিচয় দেবার আগে পর্যন্ত সাহাবারা তাঁকে চিনতে পারেননি। তবে অধিকাংশ সময় জিবরাইল (আঃ) অদৃশ্যভাবে এসে ওহী নাযিল করতেন। যদিও এই ওহী নাযিলের বিষয়টি সাহাবারা রাসুলের ভাবভঙ্গি দেখে টের পেতেন। যেমন কখনো রাসুল (সাঃ) হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে অন্যদিকে মনোযোগী হতেন। কখনা তিনি কাঁপতে থাকতেন। কখনো কখনো তাঁর মুখ দিয়ে এমন উন্নত ভাষায় (যা সাহাবারা রাসুল(সাঃ)কে অন্য সময় বলতে শোনেননি) কুরআনের আয়াত উচ্চারিত হতে থাকতো। রাসুল (সাঃ) বলেন যে, তিনি ওহী নাযিলের পূর্বে একটি শব্দ শুনতেন তাতে বুঝতেন যে জিবরাইল (আঃ) এসেছেন। এরপর তিনি ওহী শুনতে পেতেন।

উত্তরঃ (৩) রাসুল (সাঃ) মৃগীরোগে ভুগতেন এমন প্রচারণার জবাব-

আল্লাহর ওহী প্রেরণ এর বিষয়টি সব ধর্মেই স্বীকৃত। কাজেই যখন ঈসা (আঃ) মুসা (আঃ) বা কোন নবীর ক্ষেত্রেই এই প্রসঙ্গ উঠেনি রাসুল (সাঃ) এর প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক এবং অবান্তর।

মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তার ফিট এর সময়ের কথা মনে রাখতে পারে না। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। লালা এবং প্রস্রাব এর উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অথচ ইতিহাস থেকে দেখা যায় ওহী নাযিলের পর এর প্রতিটি বর্ণ রাসুল (সাঃ) মনে রাখতে পারতেন। মৃগী রোগীর কোন লক্ষণ ওহী নাযিলের সময় তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। আর কুরআন কেউ অর্থসহ পড়লে সে অবশ্যই এটা স্বীকার করবে যে এই মহাগ্রন্থ কিছুতেই কোন মৃগীরোগীর প্রলাপ হতে পারে না।

উত্তরঃ (৪) ওহী শুধু নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির উপরই নাযিল হলো কেন?

আরবী ওহী শব্দের অর্থ অনুপ্রেরণা। দুই ধরণের ওহী আছে। একটি সকল জীবকেই আল্লাহ দিয়েছেন। তা হচ্ছে নির্দিষ্ট নিয়মে জীবন পরিচালনা- এটা মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবেরও আছে। নির্দিষ্ট খাবার, বিপদ-আপদ সনাক্ত করা ইত্যাদি যোগ্যতা সব প্রাণীরই আছে। এছাড়াও মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন ভাল-মন্দে পার্থক্য করবার ও তার স্রষ্টাকে চিনবার যোগ্যতা।
আর একটি ওহী হচ্ছে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা। যা আল্লাহ তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের মাধ্যমে মানুষকে প্রদান করেন। মনোনীত ব্যক্তিরা মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছাবার এবং নিজেকে সেই বাণী বাস্তবায়নের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্যতা রাখেন। এই যোগ্যতা সব মানুষের নেই। আল্লাহ যাকে এটা প্রদান করেন শুধু তারই এটা থাকে।

উত্তরঃ (৫) রাসুল (সাঃ) এর পর ওহী নাযিল কি বন্ধ?

মুসলমানরা খতমে নবুওয়েতে বিশ্বাস করে। যার অর্থ রাসুল (সাঃ) শেষ নবী। তার পর আর কোন নবী আসবেন না। কুরআন পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীনকে উপস্থাপন করে। তাই নতুন ওহীর আর প্রয়োজন নেই। তবে মুসলমানরা এটা বিশ্বাস করে যে ধার্মিক ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছ থেকে উম্মতের সংশোধনের জন্যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। অবশ্য এই অনুপ্রেরণা ওহীর সমতুল্য নয়। নবুওয়ত এবং ওহী রাসুল (সাঃ) এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে।

উত্তরঃ (৬) নবী কারা?

নবী হচ্ছেন আল্লাহ মনোনীত মানুষ যার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের কাছে তাঁর বিধান পৌঁছান। তাঁরা আল্লাহর বাণীকে মানুষের কাছে প্রচার করে এবং নিজের জীবনে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করে নিজেকে আদর্শ হিসেবে মানুষের কাছে তুলে ধরে। তবে নবীরা আল্লাহর কোন প্রতিরূপ বা অংশ নন। কুরআন বলে যে তাঁরাও সাধারণ মানুষ মাত্র।

উত্তরঃ (৭) নবীরাও কি মানুষ?

নবীর দায়িত্ব ও প্রকৃতি কুরআনে অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এসব উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাঁরাও সবার মতই সাধারণ মানুষ। তাঁরা মানুষের মতই খেতেন, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতেন, সন্তানের জন্ম দিতেন, অসুস্থ হতেন, মৃত্যু বরণ করতেন। তবে তারা ছিলেন মানুষের মাঝে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি। যারা আল্লাহর বাণীকে মানুষের কাছে পৌঁছাবার যোগ্যতা ও আন্তরিকতা রাখতেন।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৯৬ঃ১-৫

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ১৬ঃ৬৮, ৫ঃ১১৪, ২০ঃ৩৮-৩৯, ৮ঃ১২, ১৯ঃ১০, ৬ঃ১১২

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ২১ঃ৭, ৩ঃ৫৯, ৬৪ঃ৬, ১০ঃ২, ৬ঃ৯১

প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ২৫ঃ২০, ১৩ঃ৩৮, ২৬ঃ৬৯-৮২, ২১ঃ৮৬, ২ঃ৮৭, ৩ঃ১১৪, ৭ঃ১৮৮

বি-৩ নবীদের ইসমাহ (নিষ্পাপ হবার বিষয়)

প্রশ্ন- (১) কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত নবুওয়তের দায়িত্ব ও মর্যাদার মধ্যে কোন মিল আছে কি?

প্রশ্ন- (২) নবীদের মানুষ হবার সাথে তাদের নিষ্পাপ হবার বিষয়টি কি অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

উত্তরঃ (১) বাইবেল ও কুরআন মতে নবুওয়ত-

নবুওয়তের দায়িত্ব ও মর্যাদার বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেলে কিছু বিষয়ে মিল আছে। যেমন আল্লাহতে বিশ্বাস, নবী রাসুলদের প্রতি ওহী প্রেরণের বিষয় ইত্যাদি, কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে দুই ধর্মগ্রন্থে বেশ অমিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইসলাম সঠিকভাবে সব নবী রাসুলের প্রশংসা করেছে। তাদেরকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে বাইবেলে কাউকে অতি মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং কোন কোন নবী রাসুলের উপর বিভিন্ন পাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। যেমন নিউ টেস্টামেন্টে যীশু খ্রীষ্টকে অতি মর্যাদা দিয়ে উপাস্য বানানো হয়েছে। আবার ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে ইয়াকুব তাঁর ভাইকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তাঁর বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতাকে মিথ্যা কথা বলে প্রতারণা করেন। এক্সোডাসে বলা হয়েছে এরন [হারুণ(আঃ)] বনী ইসরাইলী মূর্তিপূজারীদের সাথে বাছুরের মূর্তি পূজার বিষয়ে আপোষ করেন। বুক অব স্যামুয়েলে বলা হয়েছে দাউদ (আঃ) জনৈক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেন এবং তাঁর অপরাধ লুকানোর জন্য মহিলার স্বামীকে হত্যা করেন। এ ধরনের আরো অনেক নবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে।

অন্যদিকে কুরআনে নবীদের কোন অপরাধের বিষয়ে সামান্যতমও উল্লেখ নেই। বরং তাদের চিত্রিত করা হয়েছে সৎ, মহৎ, বিশ্বস্ত হিসেবে। সম্মান, পবিত্রতা, সততা ও আল্লাহর আনুগত্যের মডেল হিসেবে। যেমন ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতে সম্মানিত হবেন। মুসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে নির্বাচিত। রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে বিশ্ববাসীদের জন্য আদর্শ বা মহোত্তম চরিত্র।

বস্তুতঃ কুরআনের বর্ণনাই বাস্তব এবং যৌক্তিক। নবী রাসুলরা মানুষের কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছান। নিজেরা সে বিধান বাস্তবায়নের মূর্ত প্রতীক হিসাবে কাজ করেন। কাজেই তাঁদের পক্ষে মিথ্যাবাদী, প্রতারক মূর্তি পূজার সাথে আপোষকারী হওয়া বা অন্য কোন অপরাধে জড়িত হওয়া অবাস্তব এবং অসম্ভব। ইসলাম নবী রাসুলদের নিষ্পাপ (ইসমাহ) হবার ধারণা দেয়।

উত্তরঃ (২) নবীরা মানুষ হয়েও নিষ্পাপ কিভাবে? (কারণ ভুল করা তো মানুষের বৈশিষ্ট্য)-

নবীদের নিষ্পাপ হবার বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কেন্দ্রীভূত দুটো বিষয়ে যথা-

(ক) তাঁরা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন ভুল বা অন্যায় করতে পারেন না। যেমন কোন নবীই আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপাস্য বানাননি বা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেননি। কোন নবী নিজেকে উপাস্য বানাননি। এসব ক্ষেত্রে কারো দূর্বলতা থাকলে তাঁর উপর ওহী আসতো না।

(খ) তাদের দ্বারা নৈতিক অপরাধ হতে পারে না। আল্লাহর নবী মানুষের কাছে ভাল ব্যবহার ও উত্তম চরিত্রের মডেল। নবীরাও মানুষ। সাধারণ মানবীয় ভুল তাঁদের হতে পারে। এমন দু একটি ভুলের জন্য আল্লাহও তাদের সতর্ক করেছেন। অবশ্য এসব সরল মানবীয় ভুল তাদের নিষ্পাপ হবার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে না- ভুল এবং পাপ এক নয়। নবীদের বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনা কুরআনের সাপেক্ষে কোথাও কোথাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) জেনেসিস ২৭, এক্সোডাস ৩২ঃ১-৬

(২) Samuel ১৯ঃ৪১, ১৬ঃ১২০, ১৯ঃ৫৪, ১৯ঃ৫১, ৩ঃ৪৫, ৩৩ঃ২১, ২১ঃ৯০, ২২ঃ৯০, ২২ঃ৭৫, ৬ঃ৮৬-৮৭, ২১ঃ৭৩

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ৬৯ঃ৪৪-৪৭

রাসূল (সাঃ) কুরাইশ বংশের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে যখন বৈঠক করছিলেন তখন এক অন্ধ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁর কাছে কিছু প্রশ্ন জানতে চাইলে রাসুল (সাঃ) তাঁর চোখ সরিয়ে নেন। রাসূল (সাঃ) এর এই কাজের বিষয়ে কুরআনের উপরের আয়াতগুলো নাযিল হয়।

বি-৪ নবুওয়তের প্রকৃতি

প্রশ্ন- (১) বাইবেলের পাঠকদের মনে এমন ধারণা হতে পারে যে নবী মানেই সফল ভবিষ্যৎ বক্তা। মুসলমানরা কি নবুওয়তের সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করার বিষয়টিকে সম্পৃক্ত মনে করে?

প্রশ্ন- (২) নবীদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

প্রশ্ন- (৩) নবীদের মোজেজা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৪) কোন নবীর মোজেজার গুরুত্ব কি?

প্রশ্ন- (৫) কুরআনে কতজন নবী রাসুলের কথা বলা হয়েছে?

প্রশ্ন- (৬) কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবী রাসুল ছাড়া অন্য নবীদের ব্যাপারে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৭) কুরআনে উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত নবীদের ব্যাপারে মুসলমানদের দায়িত্ব কি?

উত্তরঃ (১) নবুওয়ত ও ভবিষ্যদ্বাণী-

নবুওয়ত এবং নবীদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। প্রথমতঃ মুসলিম মতে শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করাই একজন নবীর একমাত্র কাজ নয়। বস্তুতঃ নবীর বিশাল কর্মপরিধির এক সামান্য অংশ হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী করা। তাঁর মূল মিশন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে মানুষের জীবনকে পুনর্বিন্যাস করা। ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা তাঁর এই মিশন বাস্তবায়নে সহায়ক মাত্র।

উত্তরঃ (২) নবীদের ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাথে নবুওয়তের সম্পর্ক-

নবীদের বুদ্ধিমত্তার সাথে নবুওয়তের সম্পর্ক হচ্ছে ব্যক্তিগত জ্ঞান প্রজ্ঞার সাথে আধ্যাত্মিক নির্দেশনার এক ভারসাম্য। তাঁরা যা প্রচার করতেন তা তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রসূত নয় বরং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত।

উত্তরঃ (৩) (৪) নবীদের মোজেজা-

মোজেজা নবুওয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলোকে সময় ও ঘটনার প্রেক্ষিতে যথাযথভাবে বিবেচনা করা উচিৎ। কোন অতি মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন করা ঠিক নয়। আল্লাহ নবীদের তাঁর নিদর্শন হিসাবেই মোজেজা দিতেন। মোজেজা ওহীর অংশ নয়। প্রত্যক্ষ মোজেজা দেখেও অনেক অবিশ্বাসী ঈমান আনেনি।

উত্তরঃ (৫) (৬) (৭) কুরআনে বর্ণিত ও অনুল্লিখিত নবীরা-

কুরআনে পঁচিশজন নবী রাসুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাঁদের উল্লেখ ইহুদী খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়। কুরআন মতে আল্লাহ আরও অনেক নবী প্রেরণ করেছেন। যাদের নাম আমরা জানি না। ব্যাপকভাবে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে সবাই একই দ্বীন-ইসলাম প্রচার করেছেন। এসব নবীর প্রতি বিশ্বাস আনা মুসলমানদের ঈমানের অংশ।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ২১ঃ৬৮-৬৯, ২৬ঃ৬৩, ৩ঃ৩৮-৪০, ৩ঃ৪৫-৪৭, ১৭ঃ৮৮, ৪০ঃ৭৮

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৩ঃ১৮৩, ১৭ঃ৯২-৯৩

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ৬ঃ৮৩-৮৬

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ৩৫ঃ২৪, ১০ঃ৪৭, ৪০ঃ৭৮

প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ২ঃ১৩৬, ২ঃ১৭৭, ৪ঃ১৫০

বি-৫ নবুওয়তের প্রকৃতি ও খতমে নবুওয়ত

প্রশ্ন- (১) নবীদের মূল মিশন কি?
প্রশ্ন- (২) ইসলাম কি মর্যাদার ভিত্তিতে নবীদের পৃথক করেছে?
প্রশ্ন- (৩) খতমে নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা কি?
প্রশ্ন- (৪) সপ্তম শতকেই কেন নবুওয়তের মিশন শেষ হলো?
প্রশ্ন- (৫) রাসুল (সাঃ) এর পর আল্লাহর নির্দেশনা আসবার পথ কি চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

উত্তরঃ (১) নবীদের মিশন-

শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করা আর মোজেজা দেখানোই নবীর মিশন নয়। নবীদের দায়িত্ব নিম্নরূপঃ-

(ক) তাঁর মূল দায়িত্ব তাওহীদের ভিত্তিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সব নবীরই প্রাথমিক কাজ ছিল মানুষের মাঝে একত্ববাদ কায়েম করা।

(খ) তাঁরা ছিলেন মাধ্যম, যার সাহায্যে আল্লাহ মানব জাতিকে তাঁর দিক নির্দেশনা দিতেন। তাঁরা নিজের মনগড়া কোন নির্দেশনা দিতেন না।

(গ) তাঁরা মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হতেন। তাঁরা মানুষকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতেন। সে পথে চলতে মানুষকে সাহায্য করতেন।

(ঘ) তাঁরা অসত্য ও অন্যায় এর মূলোৎপাটনে লড়াই করতেন। রাসুল (সাঃ) এর জীবনে এমন লড়াইয়ের অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়।

উত্তরঃ (২) মর্যাদার ভিত্তিতে নবীদের শ্রেণীবিন্যাস প্রসঙ্গে-

ইসলাম সব নবীকেই একই দ্বীনের প্রচারক হিসেবে ভাইয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে তাঁদের মর্যাদা বিভিন্ন হতে পারে। কুরআনে বিশেষ মর্যাদাবান হিসেবে পাঁচ জনের কথা বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন- নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ)। শেষ নবী এবং দ্বীনের পূর্ণতাদানকারী হিসেবে মুহাম্মদ (সাঃ)কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবী গণ্য করা হয়।

উত্তরঃ (৩) খতমে নবুওয়ত-

খতমে নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে নিম্নলিখিত সত্যগুলো উপলব্ধি করতে হবে-

(ক) ইসলামের মূল কথা হচ্ছে একত্ববাদ।
(খ) মুসলমানরা মানবতার ঐক্যে বিশ্বাস করে।
(গ) এক বিশ্ব- এক জগত।
(ঘ) সমগ্র জগত এক আল্লাহর আইনে পরিচালিত হয়।
(ঙ) মানবজাতির একটি মূল লক্ষ্য— পৃথিবী এবং আখেরাতে উন্নতি ও শান্তি লাভ।

এসব সত্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে সমগ্র মানব জাতির জন্য এক কিতাব এবং নবুওয়ত প্রয়োজন। যৌক্তিকভাবেই একজন নবীর প্রয়োজন যিনি এসে পূর্বে প্রচারিত সব নবীর দ্বীনকে

স্বীকৃতি দিয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য এক দ্বীন ও কিতাব রেখে যাবেন। যা সর্বকালের সব জাতির মানুষের জন্য নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। সমগ্র মানব জাতিকে এক করবে।

উত্তরঃ (৪) শেষ নবী সপ্তম শতকে আসার যৌক্তিকতা-

সপ্তম শতকেই কেন নবুওয়তের মিশন শেষ হলো তার উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় যে এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছে। এর পিছনে কারণ সম্ভবত এই যে-

(ক) এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল।

(খ) মানব সভ্যতা আল্লাহর বাণী সংরক্ষণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

(গ) শেষ নবীর আগে প্রচারিত ধর্মগুলো কিংবদন্তী, দর্শন ও পুরাণ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল।

(ঘ) এ সময়ের মধ্যে মানবতা যথেষ্ট পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

উত্তরঃ (৫) রাসুল (সাঃ) এর পর কি আল্লাহর নির্দেশনা আসার পথ বন্ধ-

শেষ কিতাব ঈমানের আলোকে মানুষের জীবন পরিচালনার মৌলিক ও সাধারণ নীতিগুলো দিয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে থেকে মুসলিম জাতির বিশেষজ্ঞরা সব যুগের, সব সময়ের, সব সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান তৈরি করতে পারবেন। কিতাবে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আইনকে যুগের প্রয়োজনমত সংস্কার করতে পারবেন। কিন্তু রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর পর আর কোন নবী আসবেন না এটা নিশ্চিত।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ২১ঃ২৫, সুরা-১১ বিভিন্ন স্থানে, ১৬ঃ৩৬, ২ঃ২১৩, ৩ঃ১৬৪, ৫৭ঃ২৫

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ২ঃ২৮৫, ২ঃ২৫৩, ৪৬ঃ৩৫

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ৩৩ঃ৪০, ৭ঃ১৫৮, ৫ঃ৩

বি-৬ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআন

প্রশ্ন- (১) কুরআনে ঈসা (আঃ) এর জীবনী কিভাবে এবং কত স্থানে বর্ণিত হয়েছে?

প্রশ্ন- (২) কুরআনে ঈসা (আঃ) কি নামে বর্ণিত হয়েছেন?

প্রশ্ন- (৩) ঈসা (আঃ) যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁর বর্ণনা কুরআন কিভাবে দিয়েছে?

প্রশ্ন- (৪) কুরআন তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে কি বলে?

প্রশ্ন- (৫) মরিয়ম (আঃ) কি জানতেন যে তাঁর সন্তান জন্ম হবে এবং তিনি নবী হবেন?

প্রশ্ন- (৬) বিবি মরিয়ম (আঃ) কি স্বাভাবিক ভাবেই সন্তান প্রসব করেন?

প্রশ্ন- (৭) ঈসা (আঃ) এর জন্মের পর মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কুরআন কিছু বলে কি?

প্রশ্ন- (৮) কুরআন ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্মগ্রহণের স্বীকৃতি দিয়েছে। ঈসা (আঃ)-এর পিতৃপরিচয় সম্পর্কে কি মন্তব্য করবেন?

উত্তরঃ (১) কুরআনে ঈসা (আঃ)-

কুরআনে ১১টি সুরাতে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সুরা নং ২,৩,১,৫,৯,১৯,২১,২৩,৪৩,৫৭,৬১। এর মধ্যে তিনটি সুরায় বিস্তারিতভাবে তাঁর জীবনী এবং মিশন আলোচিত হয়েছে। ৩টি সুরার শিরোনাম ঈসা (আঃ) এর পরিবারের ব্যক্তিদের নামে অথবা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার নামে রাখা হয়েছে। যেমন- তৃতীয় সুরা আল-ইমরান। পঞ্চম সুরা মায়েদা এবং ঊনবিংশ সুরা মরিয়ম। এভাবে এই নবীর মিশন ও জীবনী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

উত্তরঃ (২) ঈসা (আঃ)কে যে নামে সম্বোধন করা হয়েছে-

কুরআনের কয়েকটি আয়াতে তাঁকে ঈসা (যার ইংরেজী Jesus) সম্বোধন করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানে তাঁকে আল-মাসীহ সম্বোধন করা হয়েছে। মাসীহ শব্দটি 'আল মাসিয়াহ' থেকে এসেছে যার অর্থ অভিষিক্ত।

উত্তরঃ (৩) ঈসা (আঃ) এর জন্মের পটভূমি-

ঈসা (আঃ) এর জন্মের সময় লোকজন ধর্মের চরম বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করছিল এবং চরম বস্তুবাদী হয়ে পড়েছিল। কুরআন এবং বাইবেল উভয় কিতাবেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বনী ঈসরাইল জাতি তাদের কাছে এর পূর্বে প্রেরিত দুজন নবীর শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়েছিল। ক্ষমা, দানশীলতার মত কোন সদগুণই তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তারা চোখের বদলে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত নিত। সুদের জমজমাট কারবার সমাজকে শোষণের আখড়ায় পরিণত করেছিল। এই পটভূমিতে ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্ম ছিল মানুষের জন্য আল্লাহর এক নিদর্শন। এর মাধ্যমে তাদের আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার কথা এবং তাদের পদস্খলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

উত্তরঃ (৪) কুরআন মতে ঈসা (আঃ) এর বংশ পরিচয়-

কুরআন বলে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশেই ঈসা (আঃ)-এর জন্ম। এই বংশেই মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ নবীর জন্ম। ঈসা (আঃ)-এর নানী ইমরান (আঃ)-এর স্ত্রী পর্যন্ত ঈসা (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষের পরিচয় কুরআনে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তান যেন আল্লাহর কাজে লাগে সেজন্য দোয়া করতেন। তাঁর সন্তান মরিয়ম (আঃ)-এর জন্মের পর তাঁকে জাকারিয়া (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়, তাকে ধার্মিকভাবে গড়ে তোলার জন্য।

উত্তরঃ (৫) মরিয়ম (আঃ) কি ঈসা (আঃ) এর জন্মের বিষয় অবহিত হয়েছিলেন?

কুরআন মতে মরিয়ম (আঃ) অবহিত হন যে তাঁর সন্তান হবে এবং তিনি নবী হবেন। কুরআন মতে তিনি কারো সাথে বিয়ে ছাড়াই গর্ভবতী হন (যদিও বাইবেলে বর্ণিত আছে, যোসেফ নামে একজন মিস্ত্রীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল)। ঈসা (আঃ) এর জন্ম ছিল কোন পুরুষের ঔরস ছাড়া। ফলে এক মহান মোজেজার মাধ্যমে জন্ম নিয়ে তিনি মিশন শুরু করেন।

উত্তরঃ (৬) ঈসা (আঃ) এর জন্ম-

কুরআন মতে মরিয়ম (আঃ) এর গর্ভাবস্থা স্বাভাবিকভাবেই অতিবাহিত হয়। যদিও এ সময় তিনি মানসিকভাবে শঙ্কিত ছিলেন এই ভেবে যে মানুষ তাঁর কুমারী মাতৃত্বকে ভিন্ন চোখে দেখতে পারে। অবশ্য অলৌকিক ভাবে ঈসা (আঃ) জন্মের পরই কথা বলতে শুরু করেন, তিনি তাঁর মাকে আশ্বস্ত করেন এবং লোকের প্রশ্নের জবাবে কি বলতে হবে তা বলে দেন।

উত্তরঃ (৭) ঈসা (আঃ) এর জন্ম সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া-

কুরআন বলে ঈসা (আঃ) এর জন্মের পর মানুষ প্রথমে মরিয়ম (আঃ) এর সতীত্বের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। অবশ্য নবজাত শিশু ঈসা (আঃ) এ সময় কথা বলা শুরু করেন। তিনি তাঁর মায়ের পক্ষে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, তিনি আল্লাহর দাস। আল্লাহ তাঁকে কিতাবসহ রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে রহমত করেছেন।

উত্তরঃ (৮) ঈসা (আঃ) এর পিতা কে ছিলেন?

কুরআন এ প্রশ্নের উত্তর দুটো বাক্যে দিয়েছে। কুরআন বলে যে, ঈসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক হচ্ছে আদম (আঃ) এর সাথে তাঁর সম্পর্কের মত। আদম (আঃ)কে মাটি থেকে তৈরি করে যখন বললেন হয়ে যাও অমনি আদম (আঃ) প্রাণ লাভ করলেন।

আদম (আঃ) পিতা এবং মাতা ছাড়াই তৈরি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেনি। এটা আল্লাহর ক্ষমতার অধীন বলে সবাই মেনে নিয়েছে। যে আল্লাহ পিতা-মাতা ছাড়াই আদম (আঃ)কে তৈরি করতে পারেন, তিনি পিতা ছাড়াই ঈসা (আঃ)কে তৈরি করতে পারবেন এটাই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন (যথা-প্রজনন) আল্লাহই তৈরি করেছেন। তিনিই পারেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে দেখাতে।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৩ঃ৩৩
প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ১৯ঃ১৬-২১
প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ১৯ঃ২২-২৬
প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ১৯ঃ২৭-৪০
প্রশ্ন- (৮) আল কুরআন ৩ঃ৫৯, ৩ঃ৪৫-৪৯

বি-৭ ঈসা (আঃ) এর প্রকৃতি

প্রশ্ন- (১) ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্ম কি তাকে ঐশ্বরিক মর্যাদা দিয়েছে?

প্রশ্ন- (২) কুরআন এবং বাইবেল উভয়েই ঈসা (আঃ)কে 'কালিমাত উল্লাহ' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপারে খ্রীষ্ট-মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য কেন?

প্রশ্ন- (৩) পবিত্র আত্মা (Holy Spirit) শব্দ কি কুরআন ও বাইবেলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? কেউ কেউ বলে কুরআন ঈসা (আঃ) এর আল্লাহর পুত্র হবার ধারণা নাকচ করলেও তাঁর উপাস্য হবার বিষয়টি নাকচ করেনি। এর উত্তরে কি বলবেন?

প্রশ্ন- (৪) আল্লাহ কুরআনে অনেক জায়গায় নিজেকে উল্লেখ করতে গিয়ে আমি না বলে আমরা বলেছেন এতে কি মনে হয় না যে আল্লাহর আরও শরীক আছেন?

প্রশ্ন- (৫) বাইবেলে বর্ণিত লর্ড এবং ঈশ্বরের পুত্র (Son of God) এই শব্দ দুটোর ব্যাখ্যা মুসলমানরা কিভাবে করবে?

প্রশ্ন- (৬) ঈসা (আঃ) নিজে কি তাঁর উপাস্য হবার বিষয় নাকচ করেছেন?

উত্তরঃ (১) ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গে-

বিনা ঔরসে ঈসা (আঃ) এর জন্ম এক অবিস্মরণীয় অলৌকিক ঘটনা। অবশ্য লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহ তাঁর নিদর্শন ও নবুওয়তের প্রমাণ হিসেবে প্রায় প্রত্যেক নবীকেই কোন না কোন মোজেজা দান করেছেন। যেমন ইব্রাহীম (আঃ) কে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝেও তিনি জীবিত রাখেন। মুসা (আঃ) এর হাতের লাঠিকে তিনি সাপে পরিণত করেন। রাসুল (সাঃ) এর মোজেজা ছিল আল কুরআন। যা দেড় হাজার বছর পর আজও অবিকৃত এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃতই থাকবে। প্রত্যেক নবীর মোজেজাই তাঁর স্থান কালের সাপেক্ষে আল্লাহ প্রদান করেছেন। ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় মানুষ আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভুলতে বসেছিল। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে তারা প্রত্যেক বিষয়কে 'কারণ ও ফল' (Cause or effect) এর সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করা শুরু করেছিল। ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্ম দিয়ে আল্লাহ তাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। বুঝাতে চেয়েছিলেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কোন পিতৃত্ব ছাড়াই সন্তান জন্মাতে পারেন। তিনি কোন নিয়মের অধীন নন।

উত্তরঃ (২) কালিমাত-আল্লাহ এর অর্থ-

'জন-১ এ' উদ্ধৃত আছে "The word was with God and the word was God" এ থেকেই বাইবেলে বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করেন যে, 'The Word' শব্দটির একটি ঐশ্বরিক মর্যাদা আছে। কিন্তু এর সঠিক বর্ণনা এসেছে আল কুরআনে। সেখানে শব্দটি 'Word' (কালিমাত) একটি আদেশ (Command) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন বলে যে, প্রত্যেক

মানুষই আল্লাহর আদেশে সৃষ্ট। আল্লাহ্ যখন বলেন, 'হয়ে যাও' (কুন) তখনই তা হয়ে যায়। কাজেই ঈসা (আঃ) ও আল্লাহর আদেশে আর সব মানুষের মতই সৃষ্ট।

উত্তরঃ (৩) পবিত্র আত্মার অর্থ প্রসঙ্গে-

পবিত্র আত্মার বিষয়ে খ্রীষ্টানদের ধারণা প্লেটোর দর্শন প্রভাবিত। কুরআনে এই শব্দের দু'ধরনের অর্থে প্রয়োগ স্পষ্টভাবেই দেখা যায়-

(ক) আত্মা (রুহ্) অর্থে- আল্লাহর ইচ্ছায় ঈসা (আঃ) এর সৃষ্টি ও তাঁকে জীবন প্রদানের বিষয়টিকে 'রুহ' শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। অহী বোঝাতেও 'রুহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নবীদের প্রতি আল্লাহর সমর্থন বোঝাতেও রুহ্ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের মাঝে আল্লাহ যে প্রাণ ফুঁকেছেন তাকে 'রুহ' বলা হয়েছে।

(খ) রুহ-ইল-কুদ্দুস বা রুহ-ইল-আমীন এই দুটো শব্দ জিবরাইল (আঃ) এর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যিনি নবী-রাসুলদের কাছে আল্লাহর ওহী নিয়ে আসতেন।

ইসলাম এ শিক্ষাই দেয় যে, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহই এ জগতের সকল কিছুর স্রষ্টা। জিবরাইল ফেরেশতাও তাঁর সৃষ্ট। কাজেই এদের কারোরই উপাস্য হবার যোগ্যতা নেই।

উত্তরঃ (৪) ঈসা (আঃ) কি উপাস্য ছিলেন?

কুরআন শুধু ঈসা (আঃ) এর আল্লাহর পুত্র হবার বিষয়টিই নাকচ করেনা বরং তার উপাস্য হবার বিষয়টিও নাকচ করে দেয়। এক আয়াতে বলা হয়েছে হাশরের দিন ঈসা (আঃ) তাকে উপাসনাকারীদের ভুল ধরিয়ে দিবেন। কুরআন ত্রিত্ববাদের ধারণা বাতিল করেছে এবং ত্রীত্ববাদে বিশ্বাসীদের কঠিন শাস্তির কথা বলেছে। ঈসা (আঃ) যে অন্যান্য নবীদের মতই একজন নবী ছিলেন কুরআন তাই গুরুত্বের সাথে বলেছে।

উত্তরঃ (৫) কুরআনে আল্লাহর নিজ প্রসঙ্গে 'আমরা' শব্দের ব্যবহার-

আরবীতে শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজকীয়তা বোঝাতে 'আমি' এর পরিবর্তে 'আমরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আরবী ছাড়াও আরও অনেক ভাষায় এই রীতি দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই রাজা অথবা জগতের স্রষ্টা নিজকে সম্বোধন করতে এই শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। আল্লাহর একত্ব এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সমগ্র কুরআন জুড়ে উদ্ধৃতি রয়েছে। কাজেই 'আমরা' শব্দের ব্যবহার একত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করে না।

উত্তরঃ (৬) 'লর্ড' এবং 'ঈশ্বরের পুত্র' শব্দ দুটো সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী-

(ক) লক্ষ্য করা যায় যে বাইবেলে লর্ড শব্দটি সব সময় স্রষ্টা বলতে ব্যবহৃত হয়নি বরং সম্মানিত বা প্রভু (পার্থিব অর্থে Master) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এটাকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় শব্দ মনে করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

(খ) ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট থেকে এটা দেখা যায় ঈশ্বরের পুত্র বলতে তার নিকটের বা তার প্রিয় কাউকেই বুঝানো হয়েছে। নিউ টেস্টামেন্টে যেখানে ঈসা (আঃ)কে পুত্র ও আল্লাহকে পিতা বলা হয়েছে সেখানে রূপক অর্থেই শব্দ দুটো

ব্যবহৃত হয়েছে। রূপকভাবে সব মানুষই আল্লাহ্‌র সন্তান কারণ তিনিই তাদের জীবন দেন, লালন পালন করেন এবং ভালবাসেন।

উত্তরঃ (৭) ঈসা (আঃ) নিজেই তাঁর উপাস্য হবার বিষয় নাকচ করেছেন-

ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্ম ও তাঁকে 'কালিমাত-উল্লাহ' সম্বোধন তাঁকে উপাস্যের মর্যাদা দেয়া এটা নিশ্চিত। এছাড়া খোদ নিউ টেস্টামেন্টেও দেখা যায় ঈসা (আঃ) নিজে তাঁকে খোদার অংশ মনে করতেন না। কারণ সেখানে উল্লেখিত আছে যে শয়তান তাঁকে ধোকা দিতে চেষ্টা করত। বাস্তবে শয়তান তো মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় কোন স্রষ্টাকে প্ররোচিত করার সাধ্য তো তার নেই। তিনি প্রায়ই প্রার্থনার জন্য নির্জনে চলে যেতেন। স্রষ্টার কি আদৌ কোন প্রার্থনার দরকার আছে। মানুষ যখন তাঁকে অতি সম্মান করত তখন তিনি বলতেন, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একজন আছেন তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ১৯ঃ১৬, ১৬ঃ৪০
প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৪২ঃ৫২, ৫৮ঃ২২, ৪ঃ১৭১, ৩২ঃ৯, ২ঃ৮৭, ১৯ঃ১৭
প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৫ঃ১১৬-১২০, ৫ঃ৭২-৭৩, ১১২
প্রশ্ন- (৬) Exod ৪ঃ২২-২৩, Psalms ২ঃ৯, Chron ২২ঃ১০ Matt ৫ঃ৯, ৫ঃ৪৫, ২৩ঃ৯
প্রশ্ন- (৭) Matt ৪ঃ১-১১, ২৪ঃ৩৬ Mark ১০-১৮, John ১৪ঃ২৮

বি-৮ ঈসা (আঃ) এর মিশন

প্রশ্ন- (১) কুরআনে ঈসা (আঃ) এর মিশনের প্রেক্ষিত সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? বাইবেলেও কি একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে?

প্রশ্ন- (২) ঈসা (আঃ) এর শিক্ষা সম্পর্কে কুরআন কি বলে?

প্রশ্ন- (৩) ঈসা (আঃ) এর মোজেজা সম্পর্কে কুরআনে কোন বর্ণনা আছে কি?

প্রশ্ন- (৪) ঈসা (আঃ) এর উপর নাযিলকৃত কিতাব সম্পর্কে কুরআন কিছু বলে কি?

প্রশ্ন- (৫) নিউ টেস্টামেন্টে ঈসা (আঃ)এর নবুওয়তের ব্যাপারে কি প্রমাণ আছে?

প্রশ্ন- (৬) ঈসা (আঃ এর মিশন কিভাবে শেষ হলো, এ বিষয়ের বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেল কি একমত?

প্রশ্ন- (৭) কুরআনে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)কে জীবিত অবস্থায় বেহেশতে তুলে নেয়া হয়েছে- এর অর্থ কি?

প্রশ্ন- (৮) ঈসা (আঃ)'র পুনরাগমন সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তরঃ (১) ঈসা (আঃ) এর মিশন-

বাইবেলে ঈসা (আঃ) এর মিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তা ছিল শুধু বনী ইসরাইল জাতির জন্য। কুরআনেও একই কথা উদ্ধৃত হয়েছে। বাইবেলের বর্ণনায় সরাসরি এর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন কানানাইত জাতির (Canaanite) একজন মহিলা ঈসা (আঃ) এর কাছে সাহায্যের জন্য আসল তখন তিনি বলেন, আমি শুধুমাত্র বনী ইসরাইল জাতির পথহারাদের জন্য এসেছি। "I am not sent but to the lost sheep of the children of Israel".

উত্তরঃ (২) ঈসা (আঃ) এর শিক্ষা-

মূলতঃ ঈসা (আঃ) এর শিক্ষা ছিল অন্য আর সব নবীর মতই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং তাঁর আদেশ পালনে সাহায্য করা। এছাড়া কুরআন ও বাইবেলে তাঁর আরও কয়েকটি কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা-

(ক) বনী ইসরাইলদের কাছে প্রদত্ত মুসা (আঃ) এর শিক্ষার স্বীকৃতি।

(খ) আল্লাহর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাবার জন্য আরোপিত আযাব ও শাস্তি থেকে জনগণকে মুক্ত করা।

(গ) আল্লাহর পক্ষ থেকে মোজেজা প্রদর্শন করা। এই মোজেজা মানুষকে আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে সচেতন ও ভীরু করে তুলবে।

(ঘ) কুরআনে বলা হয়েছে ঈসা (আঃ) এর আরও কাজ ছিল শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা যিনি দ্বীনকে পরিশুদ্ধ করতে ও পূর্ণতা প্রদান করতে আসবেন।

এছাড়াও কুরআন বলে যে, তিনি বনী ইসরাইলদের বলতেন একত্ববাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে, তিনি বলতেন, "হে বনী ইসরাইলীগণ, আমাদের প্রভূ এক এবং একক।"

উত্তরঃ (৩) কুরআনে ঈসা (আঃ) এর মোজেজা প্রসঙ্গে-

ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্মই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় মোজেজা যা সম্পর্কে কুরআনে গুরুত্বের সাথে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ তাঁকে আরও কিছু অলৌকিক কাজের অনুমতি দিয়েছিল বলে কুরআন জানায়। যেমন তিনি আল্লাহর অনুমোদনে জীবন্ত পাখি তৈরি করেছেন। মৃতকে জীবিত করেছেন। অসুস্থকে সুস্থ করেছে। অলৌকিকভাবে অল্প আহার দিয়ে অনেক মানুষকে খাইয়েছেন। মানুষের বাড়ির গোপন ভান্ডারে কি আছে সে খবর দিতে পেরেছেন।

উত্তরঃ (৪) ঈসা (আঃ)কে প্রদত্ত কিতাব সম্পর্কে কুরআন-

অনেকগুলো আসমানি কিতাব নাযিল হবার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। এর মধ্যে ঈসা (আঃ)এর উপর নাযিল হওয়া ইনজিলসহ চারটি কিতাবের নাম কুরআনে এসেছে। কুরআনে ছয়টি সুরায় বারো বার ইনজিলের নাম বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ইনজিল খ্রীষ্টানদের নতুন নিয়ম Good news এর মত কোন মানব প্রদত্ত শিরোনাম নয়। বরং এটা আল্লাহর কিতাবের আল্লাহ প্রদত্ত নাম। বস্তুতঃ বাইবেল বলে যা বর্তমানে আছে তা কোনভাবেই ইনজিল নয়। বরং ঈসা (আঃ)এর মৃত্যুর অনেক পর তাঁর সহযোগীদের লেখা তাঁর জীবনীমাত্র। এ বিষয়ে অনেক খ্রীষ্টান বিশেষজ্ঞও একমত। যদিও এতে ইনজিলের কিছু অংশ বা উপাদান আছে ইনজিলের কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। হতে পারে যখন খ্রীষ্টান নেতারা চারটি পুস্তক বাদে তাদের বাকী সব পুস্তক পুড়িয়ে ফেলেন তখন ইনজিল পুড়ে গেছে।

উত্তরঃ (৫) ঈসা (আঃ) এর নবুওয়তের ব্যাপারে নিউ টেস্টামেন্ট-

নিউ টেস্টামেন্ট থেকে এটা নিশ্চিত যে ঈসা (আঃ) নিজেকে আল্লাহর বান্দা এবং বাণী বাহক হিসেবেই প্রচার করতেন। তাঁর সহযোগিরাও তাঁকে তাই মনে করত।

উত্তরঃ (৬) ঈসা (আঃ) এর মিশনের সমাপ্তি সম্পর্কে কুরআন ও বাইবেল-

ঈসা (আঃ) এর মিশনের সমাপ্তি সম্পর্কে বাইবেল ও কুরআন একমত নয়। বাইবেল বলে যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। কুরআন এই ধারণা নাকচ করে দেয়।

উত্তরঃ (৭) 'আল্লাহ তাঁকে তুলে নেন' এর অর্থ-

ঈসা (আঃ) এর পরিণতি সম্পর্কে কুরআন 'রাফা' (অর্থ-তুলে নেয়া, তুলে ধরা) শব্দ ব্যবহার করেছে। এর তিনটি সম্ভাব্য অর্থ হতে পারে-

(ক) আল্লাহ তাঁকে সশরীরে তুলে নেন। যেটা বৈজ্ঞানিকভাবে হয়তো ব্যাখ্যা করা যাবে না। অবশ্য আল্লাহ সবই পারেন।

(খ) আল্লাহ তাঁর আত্মাকে তুলে নেন। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে যে কুরআন বলে প্রত্যেক প্রাণিকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। কুরআনে ঈসা (আঃ) নিজেও বলেন, "আমার উপর শান্তি আছে যে দিন আমি জন্ম নেই। যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যে দিন আমি পুনর্জীবিত হব" কুরআন আরও বলে যে আল্লাহ ঈসা (আঃ)কে বলেন- "আমি তোমার মেয়াদ শেষ করছি এবং তোমার আত্মাকে তুলে নিচ্ছি।"

(গ) সর্বশেষে তুলে নেয়া বলতে এটা হতে পারে যে, আল্লাহ ন্যায়বান নবী হিসেবে তাঁর মর্যাদাকে তুলে ধরবেন।

উত্তরঃ (৮) ঈসা (আঃ) এর পুনরাগমন প্রসঙ্গে-

এ বিষয়ে কুরআনে কোন উল্লেখ নেই। কয়েকটি হাদিসে উল্লেখিত আছে যে, তিনি আসবেন। অবশ্য তাঁর এই আগমন হবে তাঁর ভ্রান্ত অনুসারীদের পথ দেখাতে। রাসুল (সাঃ)-এর শেষ নবুওয়তের স্বীকৃতি দিয়ে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলতে।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৩ঃ৪৯, ৬১ঃ৬, ৫ঃ৪৯, Matt ১৫ঃ২৪, ১০ঃ৫-৬

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৩ঃ৫০, ৬১ঃ৬, Mark ১২ঃ২৯

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৩ঃ৪৯

প্রশ্ন- (৫) Luke ১৩ঃ৩৩-৩৪, ৭ঃ১৬ John ৮ঃ৪০

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ৪ঃ১, ৪ঃ৫৬-৫৭

প্রশ্ন- (৭) ৪৩ঃ৬১ (Glorius Quran- Yusuf Ali)

বি-৯ অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক

প্রশ্ন- (১) অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআনে কোন নির্দেশনা আছে কি? এ নির্দেশনার কোন ব্যতিক্রম রয়েছে কি?

প্রশ্ন- (২) বিশেষভাবে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কুরআনে কোন উদ্ধৃতি আছে কি?

প্রশ্ন- (৩) ইহুদী- খ্রীষ্টানদের বন্ধু বানাতে কুরআনে কোথাও নিষেধ করা হয়েছি কি?

প্রশ্ন- (৪) অমুসলিমরা শত্রুতা পরিহার করলে তাদের সাথে সম্পর্কের বিষয় পুনর্বিবেচনা করা যাবে কি?

প্রশ্ন- (৫) বাস্তব জীবনে ইহুদী- খ্রীষ্টানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার বিষয়ে ইসলাম তাগিদ দেয় কি?

উত্তরঃ (১) অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআন-

সকল নবীর উপর ঈমান এবং তাঁদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং বাস্তব জীবনে এবং সমাজে তার পূর্ণ প্রয়োগ ঘটাতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনের ৬০ নং সুরার ৮ থেকে ৯ নং আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে যেসব অমুসলিম মুসলমানদের বা ইসলামের সাথে শত্রুতা করেনা তাদের সাথে ন্যায়, সহানুভূতি ও দয়ার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এই আয়াতে অমুসলিমদের প্রতি সদয় হবার জন্য 'বির' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । ঐ একই শব্দ পিতা-মাতার প্রতি সদয় হবার তাগিদ দিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ইসলাম অমুসলিমের সাথে সম্পর্কের বিষয়কে কত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। মুসলিম জনপদে শান্তিপূর্ণভাবে বাসকারী অমুসলিমের সকল অধিকার রক্ষা মুসলমানদের দায়িত্ব। তাকে কোনভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না।

অমুসলিমের এই অধিকার যেসব ক্ষেত্রে স্থগিত হবে তা নিম্নরূপঃ-

(ক) যে অমুসলিম মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা বা ঘৃণা পোষণ করে অথবা তাদের আক্রমণ করে।

(খ) যারা মুসলমানদের তাদের বাড়ি-ঘর থেকে উৎখাত করতে চায়।

(গ) যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনকারীদের সহযোগিতা বা সমর্থন করে। বস্তুত যারা শত্রুতা করে বা ধ্বংস করতে চায় তাদের সাথে এমনিতেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নেই।

উত্তরঃ (২) ইহুদী- খ্রীষ্টানদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআন-

কুরআন ইহুদী- খ্রীষ্টানদের আহলে কিতাব (আল্লাহর কাছ থেকে কিতাব প্রাপ্ত) হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এদের মাঝে আল্লাহ প্রেরিত নবী এসেছিলেন এবং তাদের আল্লাহর বিধান দিয়েছিলেন। এজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে তারা মুসলমানদের জন্য নাস্তিক, পৌত্তলিক ও কাফেরদের চেয়ে কাছের। কারণ তারা-

(ক) আল্লাহতে বিশ্বাস করে।
(খ) নবুওয়তে বিশ্বাস করে।
(গ) হাশরে বিশ্বাস করে।
(ঘ) ওহীতে বিশ্বাস করে।
(ঙ) আখেরাতে শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের আশায় নীতিবান থাকে।

উত্তরঃ (৩) ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বন্ধু বানাবার ব্যাপারে কুরআনের নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে-

পঞ্চম সুরায় ৫৪ এবং ৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমানরা যেন ইহুদী-খ্রীষ্টাদের বন্ধু না বানায়। এই আয়াত অমুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য আয়াতের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ সাধারণভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণভাবে বাসকারী সকল নাগরিকের সাথে সহানুভূতির সাথে ব্যবহার করতেই কুরআনে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। অবশ্য যদি এই আয়াত নাযিলের পটভূমি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে ভ্রান্তি দূর হয়। এক সময় কিছু অসচেতন মুসলমান ব্যাপকভাবে এমন ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল যারা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজের সাথে শত্রুতা করত। এই আয়াতে এটাই সতর্ক করা হয়েছে যে মুসলমানরা যেন যারা গোপনে গোপনে ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত তাদের সাথে ঢালাও বন্ধুত্ব না করে। এই আয়াত সাধারণভাবে সকল ইহুদী-খ্রীষ্টানের জন্য প্রযোজ্য নয়।

উত্তরঃ (৪) অমুসলিমরা শত্রুতা পরিহার করলে-

এতে কোন সন্দেহ নেই যে অমুসলিমরা শত্রুতা পরিহার করলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যাবে। কুরআনে দেখা যায় যে, মুসলমানদের প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার পাওনা থাকলেও অমুসলিমরা শত্রুতা পরিহার করলে তাদের ক্ষমা করতেই বলা হয়েছে। বরং আরও বলা হয়েছে তাদের মন্দ কাজের জবাব তাদের প্রতি ভাল কাজ দিয়ে দিতে।

উত্তরঃ (৫) ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে ইসলাম-

ইসলামী আইনে মুসলমানদের ইহুদী-খ্রীষ্টানদের রান্না করা গোশত খাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদিও পৌত্তলিকদের হাতে জবাই করা পশুর গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমান পুরুষ ইহুদী বা খ্রীষ্টান মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। (এ সংক্রান্ত ইসলামের বিধানের

কারণ ও যৌক্তিকতার জন্য দেখুন এই পুস্তকের তৃতীয় খন্ডের 'জি' ২৭ ও ২৮ নং অধ্যায়।) এর মাধ্যমে তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সহনশীলতা, ঘনিষ্টতা ও বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৬০ঃ৮-৯, ৩ঃ১১৮-১২০, ৫৮ঃ২২, ৬০ঃ১১

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৫ঃ৫৪-৫৫

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৬০ঃ৭, ৪১ঃ৩৩-৩৪

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৫ঃ৫

বি-১০ ইসলামের প্রচার ও প্রসার

প্রশ্ন- (১) শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অনুমতি ইসলামে আছে কি?

প্রশ্ন- (২) ইসলাম প্রচারের সঠিক পন্থা কি?

প্রশ্ন- (৩) ইসলাম প্রচারে জেহাদের ভূমিকা কি?

প্রশ্ন- (৪) ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই, এই মূলনীতি কি মুসলমানরা যথাযথভাবে পালন করেছে?

প্রশ্ন- (৫) পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকরা কি এই স্বীকৃতি দিয়েছে যে ইসলাম তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত হয়নি?

প্রশ্ন- (৬) ইসলাম যে তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত হয়নি এর পক্ষে আর কোন যুক্তি আছে কি?

উত্তরঃ (১) ধর্ম প্রচারে জোরজবরদস্তি প্রসঙ্গে কুরআন-

কুরআনের একটি আয়াত বা কোন একটি হাদীস এমন দেখানো যাবে না যাতে জোরপূর্বক ধর্ম প্রচারের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। বরং কুরআন মুসলমানদেরকে কারো উপর ধর্ম চাপিয়ে দিতে নিরুৎসাহিত করেছে। কুরআন মতে সত্য দ্বীন অবলম্বনের সুযোগ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নেয়ামত। তাই একমাত্র আল্লাহই মানুষকে ইসলাম কবুল করাতে পারেন। মানুষের বিশ্বাসের একমাত্র বিচারক আল্লাহ। রাসুল (সাঃ)কেও বলা হয়েছে যে তাঁর কাজ শুধু মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো। এরপর যে ইসলাম কবুলের ইচ্ছা মনে আনবে স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে পথ দেখাবেন। মুসলমানদেরও একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বস্তুতঃ বিশ্বাস এমন এক জিনিস যা পৃথিবীতে কোন শক্তিই মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না।

উত্তরঃ (২) ইসলাম প্রচারের অনুমোদিত পন্থা-

কুরআন বলে, "ডাকো তোমার রবের দিকে মধুর সংলাপ ও বুদ্ধিমত্তার সাথে। তাদের সাথে যুক্তি তর্ক কর নির্ভূল ও শ্রেষ্ঠ পন্থায়। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন কে তাঁর পথ থেকে দূরে থাকবেন এবং কে হেদায়েত লাভ করবেন" (১৬ঃ১২৫)। ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে কুরআন বলে যে তাদের সাথে অপ্রয়োজনে তর্ক বা ঝগড়ায় জড়িয়ে না পড়তে।

উত্তরঃ (৩) ইসলাম প্রচারে জেহাদের ভূমিকা-

জেহাদ শব্দের ইংরেজী অনুবাদ করা হয় 'Holy war' বা 'পবিত্র যুদ্ধ'। অথচ এটা একটা ভুল অনুবাদ। এর মাধ্যমে এই শব্দকে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। 'পবিত্র যুদ্ধ' বুঝাতে আরবীতে আলাদা শব্দ, "হারব-মুকাদাসা" আছে, যা কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জিহাদ শব্দ যে ধাতু থেকে এসেছে তার অর্থ চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম ও লড়াই। অর্থাৎ জিহাদ মানে হচ্ছে আল্লাহর পথে সমস্ত সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টাকে নিবেদিত করা। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনে লড়াই করা। জেহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ বলাটা ভুল বরং জেহাদ হচ্ছে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। কারণ প্রকৃত মুসলমান তারাই যারা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর

এই আত্মসমর্পণ তখনই সফল হবে যখন তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশে নিরলস সাধ্য-সাধনা চেষ্টা ও সংগ্রাম করা হবে। এটা ঠিক যে এই সাধ্য-সাধনার এক পর্যায়ে সমাজের শয়তানী শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু জেহাদের এই একটি স্তরকে দিয়ে পুরো জেহাদকে চিত্রায়িত করাটা ভুল হবে। জেহাদের সাথে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তুলনা করাটাও অবান্তর।

উত্তরঃ (৪) জেহাদের বিভিন্ন স্তর-

জেহাদের বিভিন্ন স্তর নিম্নরূপ-

(ক) নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ- এটাই হচ্ছে জেহাদের মূল। এর থেকেই জেহাদের বাকী সব স্তর উদ্ভূত। এর মানে হচ্ছে নিজের প্রবৃত্তিকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা।

(খ) সামাজিক জেহাদ-এর মাধ্যমে মুসলমানরা সমাজে প্রচলিত অন্যায়, দুর্নীতি, জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায়।

(গ) জাতীয়/আন্তর্জাতিকভাবে জেহাদ- পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত সকল শয়তানী, জুলুমবাজ শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ। এই জেহাদে শক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। এই জেহাদের ক্ষেত্র প্রয়োজনে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করতে পারে।

উত্তরঃ (৫) ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই এই শিক্ষা পালনে ইতিহাসে মুসলমানদের অবস্থান-

ঐতিহাসিকভাবে এটা বলা যায় যে, সমগ্র মুসলিম জাতির সবাই যে সব সময় পরম ভাল বা পরম খারাপ হবে এমনটি আশা করা যায় না তেমনি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য পুরো জাতিকে দোষারোপ করা যায় না। স্পেনের জাতিগত নির্মূল অভিযান ও গণহত্যা, ক্রুসেডের রক্ত ক্ষয় বা উত্তর আয়ারল্যান্ডের সংঘাত দেখে যেমন সমগ্র খ্রীষ্টান জাতিকে দোষী করা ঠিক নয় তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসের কোথাও কখনো দু'একজন কুরআনের শিক্ষা বর্জিত মুসলিমের ব্যবহার থেকে ইসলামকে বিচার করার সুযোগ নেই। সামগ্রিকভাবে সব সময়েই মুসলমানরা তাদের অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে সৎ ও সদয় ছিল।

উত্তরঃ (৬) ইসলাম যে তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত হয়নি এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি-

ইসলাম তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত হয়েছে এমন অভিযোগ যারা করেন আসলে তারা রূপকথার গল্পের মতই মিথ্যাচার করে। বর্তমানকালের কোন প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক এমন কথা বলেন না। কেউ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চাইলে বানর্ডশ, টয়েনবী, এইচ.জি.ওয়েলস, জেমস মিশনার এর লেখা পড়ে দেখতে পারেন।

উত্তরঃ (৭) ইসলাম যে তলোয়ারের সাহায্যে বিস্তৃতি হয়নি এর পক্ষে আরও প্রমাণ-

উপরের যুক্তিগুলো ছাড়া আরও কিছু বাস্তব উদাহরণ আছে। যথা-

(ক) পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া যেখানে ২১০ মিলিয়ন মুসলমান এবং রাশিয়া যেখানে ৫০ মিলিয়ন মুসলমান রয়েছে। এই দুটি দেশে ইতিহাসে কখনও কোন মুসলিম সেনাবাহিনী যায়নি।

(খ) একজন মুসলমান পুরুষকে তার ইহুদী বা খ্রীষ্টান স্ত্রীকে পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে চাপ প্রয়োগের কোন সুযোগ ইসলাম দেয়নি। সেই ইসলাম এর অনুসারীরা কিভাবে অন্যের উপর ধর্ম চাপাতে যাবে।

(গ) সেলজুকরা যখন মুসলিম রাষ্ট্র দখল করে তখন তারা মুসলমানদের উপর নিজেদের বিশ্বাস চাপায়নি বরং তারাই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ২ঃ২৫৬, ১০ঃ৯৯-১০০, ১৩ঃ৪০, ২২ঃ১৭

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ১৬ঃ১২৫, ২৯ঃ৪৬, ৪৭ঃ৩১, ২২ঃ৭৭-৭৮

প্রশ্ন- (৪) পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসুল (সাঃ) বলেন আমরা এখন ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদে প্রবেশ করলাম। সাহাবারা এ কথায় অবাক হলে রাসুল (সাঃ) বলেন যে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদই শ্রেষ্ঠ জেহাদ।

সি- ১ বাইবেলে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে গবেষণার পন্থা

প্রশ্ন- (১) শেষ নবী- মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে বাইবেল থেকে কোন উদ্ধৃতি নেয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কি?

প্রশ্ন- (২) বাইবেলের কিছু অংশকে মানা বা না মানার বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৩) বাইবেলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে আভাস দেখে খ্রীষ্টানরা কি আশ্চর্য হবেন না?

প্রশ্ন- (৪) যারা বলেন যে, "তারা বহুবার বাইবেল পড়েও তাতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর কোন উল্লেখ দেখেননি" এ প্রসঙ্গে কি বলবেন?

প্রশ্ন- (৫) বাইবেলে অনাগত নবী সম্পর্কে যে ভবিষ্যত বাণীগুলো করা হয়েছে তাকি শুধুমাত্র ঈসা (আঃ) এর উপরই প্রযোজ্য? সেই সব উদ্ধৃতিকেই কি মুসলমানরা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করছে?

প্রশ্ন- (৬) বাইবেলের কোন বর্ণনাগুলো মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের ইঙ্গিত দেয়?

প্রশ্ন- (৭) যারা বলে বিবি হাজেরার মাধ্যমে ইব্রাহীম (আঃ) এর যে বংশ ধারা তা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ বিবি হাজেরা ছিলেন দাসী; তাদের প্রশ্নের উত্তরে কি বলবেন?

উত্তরঃ (১) মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে তথ্যের উৎস হিসেবে বাইবেল-

মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিত্তি বাইবেল হতে পারে না। কারণ কুরআন বাইবেলকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তবে সব মুসলমানের এটা বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে বাইবেল আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিল থেকে উদ্ভূত। কাজেই এটাকে সম্মান করা মুসলমানদের উচিত। যদিও মানুষের হস্তক্ষেপে মূল ইঞ্জিল বিকৃত হয়েছে। তবুও এতে মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)এর উপর নাযিলকৃত কিছু কিছু ওহীর অংশবিশেষ রয়ে গিয়েছে। কাজেই এখান থেকে তথ্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

উত্তরঃ (২) বাইবেলের কোন অংশ গ্রহণ করা বা বর্জন করার পূর্বশর্ত-

বাইবেলের কোন অংশ গ্রহণ বা বর্জন করার পূর্বশর্ত কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন নিজেকে ঘোষণা করেছে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী হিসাবে। আর কুরআনই একমাত্র অবিকৃত আল্লাহর কিতাব। কাজেই বাইবেলের যে কোন বক্তব্যকে কুরআনের সাপেক্ষে যাচাই করে নিলেই তার সত্যতা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। বাইবেল বিকৃতির শিকার হয়েছে একথা ঠিক। কিন্তু মূল ইঞ্জিল ছিল আল্লাহরই ওহীর সংকলন। কাজেই কুরআনের সাপেক্ষে অনুসন্ধান করে এখনও বাইবেল থেকে ইঞ্জিলের অংশবিশেষ খোঁজা যেতে পারে। কুরআন নিজেই বলেছে যে, ঈসা (আঃ) রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কাজেই বাইবেলে এমন উদ্ধৃতি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

উত্তরঃ (৩) (৪) যেসব ইহুদী-খ্রীষ্টানরা বাইবেল পড়েও মুহাম্মদ (সাঃ) এর কোন উল্লেখ পাননি বলেন তাদের প্রশ্নের জবাব-

যারা বলেন বাইবেলের কোথায় মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাম আছে তাদের জন্য নিচের দুটি কথা বলা যেতে পারে।

(ক) সব বিশেষজ্ঞ একমত যে ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈসা (আঃ) এর আগমনের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের কোথাও তাঁর নাম দেখা যায়না। অবশ্য তাঁর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। আরো জানা যায় যে, ইহুদীদের পথে আনতে একজন নবী আসবেন।

(খ) একইভাবে বলা যায় ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টে একজন শেষ নবীর আগমনের আভাস দেয়া হয়েছে যিনি দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। প্রকৃতপক্ষে রাসুল (সাঃ) এর আগমনের পর অনেক ইহুদী এবং খ্রীষ্টান এ জন্য মুসলমান হন যে তাদের ধর্মগ্রন্থে যাঁর আগমনের কথা বলা হয়েছিল তিনি এসে গেছেন।

উত্তরঃ (৫) বাইবেলে অনাগত নবী সম্পর্কে উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে-

এটা মনে রাখা দরকার যে মুসলমানরা বাইবেল থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন প্রসঙ্গে কোন উদ্ধৃতি চুরি করে নিচ্ছেনা। ঈসা (আঃ) মুসলমানদেরও একজন নবী। বাইবেলের যে সব বর্ণনা ঈসা (আঃ) এর সাথে মিলে না সেগুলো দেখা যায় মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথে মিলে। এ থেকে বলা যায় বাইবেলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।

উত্তরঃ (৬) মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে বাইবেল-

বাইবেলের এ সংক্রান্ত ইঙ্গিতগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- সাধারণ ও বিশেষ। 'সাধারণ' শিরোনামে দু'টো বিষয় আমরা চিন্তা করতে পারি। যথাঃ

(ক) আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশের দুই ধারা থেকেই অনেক নবী বানিয়ে সম্মানিত করবার ঘোষণা দিয়েছেন।

(খ) আল্লাহর এই ঘোষণা ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই পুত্র ইসমাইল (আঃ) এবং ইসহাক (আঃ) উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

উত্তরঃ (৭) হাজেরা (রাঃ) মর্যাদা প্রসঙ্গে-

বাইবেলেও বলা হয়েছে যে, সারা (রাঃ) নিজে হাজেরা (রাঃ)কে ইব্রাহীম (আঃ) এর একজন স্ত্রী হিসাবে বরণ করেছিলেন। কাজেই তাঁর এবং ইসমাইল (আঃ) এর মর্যাদার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠেনা।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৫ঃ১৬, Mark ১২ঃ২৯

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৭ঃ১৫৭, ২ঃ১৪৬-১৪৭, ৬১ঃ৬

প্রশ্ন- (৪) Genesis ১২ঃ-১-৩, ১৭ঃ৩-৪, ১৬ঃ১-৩, ১৬ঃ১০-১১, ২১ঃ১৭-১৮

প্রশ্ন- (৫) Genesis ২১ঃ১৩

সি-২ ভবিষ্যত নবীর বংশ পরিচয়

প্রশ্ন- (১) ইব্রাহীম (আঃ) কে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি শুধু ইসহাক (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের জন্য প্রযোজ্য?

প্রশ্ন- (২) যারা হাজেরা (রাঃ) এর মর্যাদা এবং ইসমাইল (আঃ)এর জন্মের বৈধতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে তাদের কি বলবেন?

প্রশ্ন- (৩) ইসমাইল (আঃ) এর নির্বাসন প্রসঙ্গে ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় বর্ণনায় কি মিল-অমিল আছে?

প্রশ্ন- (৪) ইসমাইল (আঃ)কে কোন বয়সে নির্বাসনে পাঠানো হয় সে বিষয়ে বাইবেল কিছু বলেছে কি?

প্রশ্ন- (৫) বাইবেলের বর্ণনার বিভিন্ন অসঙ্গতি দূর করার লক্ষ্যে খ্রীষ্টান বিশেষজ্ঞরা কি করেছেন?

উত্তরঃ (১) ইব্রাহীম (আঃ) কে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি-

ভবিষ্যত নবীর বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে বাইবেলের বক্তব্য দেখবার আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা উচিৎ। বাইবেল বলতে আমরা যা পাচ্ছি তা অনেকটাই মানব রচিত। এখানে ইসহাক (আঃ) এর বংশধরদের প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব এবং ইসমাইল (আঃ) এর বংশধরদের উপেক্ষা করার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। উপেক্ষা সত্ত্বেও আল্লাহ যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই পুত্রের বংশধারায় নবী পাঠাবার প্রতিশ্রুতি আলাদা আলাদাভাবে দিয়েছেন তার প্রমাণ বাইবেলে পাওয়া যায়। আর ইসমাইল (আঃ) এর বংশে মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া কোন নবী নেই। এ ব্যাপারে বাইবেলের সূত্র দেখুন।

উত্তরঃ (২) হাজেরা (রাঃ) এর মর্যাদা প্রশ্নে-

যারা হাজেরা (রাঃ) এর মর্যাদা এবং ইসমাইল (আঃ) এর জন্মের বৈধতার প্রশ্ন তোলেন তাদের জন্য উপযুক্ত জবাব বাইবেলেই আছে। বাইবেলে স্পষ্ট করেই বলা আছে যে হাজেরা (রাঃ) ইব্রাহীম (আঃ) এর বৈধ স্ত্রী ছিলেন। তাঁর গর্ভেই ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রথম পুত্রের জন্ম। আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই পুত্রের বংশে নবী দান করার প্রতিশ্রুতি আলাদা আলাদাভাবে দিয়েছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়তের মাধ্যমেই এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পেয়েছে।

উত্তরঃ (৩) (৪) ইসমাইল (আঃ) এর নির্বাসন প্রশ্নে কুরআন ও বাইবেল এর নির্বাসনে যাবার সময় ইসমাইল (আঃ) এবং বয়স প্রসঙ্গ-

ইসমাইল (আঃ) এবং তাঁর মায়ের নির্বাসন প্রসঙ্গ বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেলে তিনটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

(ক) তাঁদের নির্বাসনের স্থান প্রশ্নে বাইবেল বলেছে বীরসেবা/পারান, (Beer Sheba/Paran) আর কুরআন বলেছে মক্কা। অবশ্য এই নির্বাসনের সাথে জড়িত অন্যান্য ঘটনার বিশ্লেষণে জায়গাটি যে মক্কা তাই নিশ্চিত হওয়া যায়।

(খ) মুসলিম বর্ণনা মতে আল্লাহর ঐশী ইচ্ছা পূরণের জন্যেই তাঁরা মক্কায় নির্বাসনে যান। অপরদিকে বাইবেল বলে সারাহ্ (রাঃ) হিংসার বশে হাজেরা (রাঃ)কে নির্বাসনে পাঠান।

(গ) মুসলিম মতে নির্বাসনে যাবার সময় ইসমাইল (আঃ) ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। হাজেরা (রাঃ) কাঁধে করে তাঁকে মক্কা পর্যন্ত বহন করেন। তাঁকে ঝোপের মাঝে রেখে তিনি সাফা থেকে মারওয়া পর্বত পর্যন্ত পানির জন্য ছুটাছুটি করেন। বাইবেল এসব ঘটনা বর্ণনা করে কিন্তু শেষে বলে যে ইসমাইল (আঃ)এর তখন বয়স ছিল ১৪ বৎসর। যা অসঙ্গতিপূর্ণ।

উত্তরঃ (৫) বাইবেলের বর্ণনার অসঙ্গতি প্রসঙ্গে-

বাইবেলের জন্য এই অসঙ্গতি কুরআনের স্বপক্ষে তুলনা করলেই আসল সত্য পাওয়া যায়। কারণ কুরআন আল্লাহর বাণীবাহক অবিকৃত সর্বশেষ কিতাব। খ্রীষ্টান বিশেষজ্ঞরা এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করে অবশেষে একমত হয়েছে যে বাইবেলের সব কথাই খোদা প্রদত্ত নয়।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) Gen ১৭ঃ২১, ২১ঃ১, ১৭ঃ১৪
প্রশ্ন- (২) Gen ১৬ঃ৩, Deut ২১ঃ১৫-১৮
প্রশ্ন- (৩) Gen ১৬ঃ১৬, ২১ঃ১৪, ১৪ঃ৩৭, ২ঃ১৫৮
প্রশ্ন- (৪) Gen ২১ঃ১০-২১

বাইবেলের বর্ণনার অসঙ্গতি প্রসঙ্গে "The Encyclopaedia Biblica" এবং "The Interpreter's Dictionary of the Bible" দ্রষ্টব্য।

সি-৩ ভবিষ্যত নবীর সাথে মুসা (আঃ) এর সাদৃশ্য

প্রশ্ন- (১) মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়ত সম্পর্কে বাইবেলে আর কি উদ্ধৃতি আছে?
প্রশ্ন- (২) Deuteronomy'র এই বর্ণনার সম্ভাব্য আর কি কি ব্যাখ্যা হতে পারে?
প্রশ্ন- (৩) ভবিষ্যত নবী হবেন মুসার সদৃশ (Like unto Moses) Deuteronomy'র এই মন্তব্য প্রসঙ্গে মুসা (আঃ) এর সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) এর কি কি মিল দেখা যায়?
প্রশ্ন- (৪) একই শ্লোকে খোদা বলছেন যে, তিনি সেই নবীর মুখে তাঁর শব্দ পুরে দেবেন- এর ব্যাখ্যা কি?
প্রশ্ন- (৫) এই শ্লোক থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়তের পক্ষে আর কি কি যুক্তি পাওয়া যায়?
প্রশ্ন (৬) এসব শ্লোক থেকে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের উপর কি দায়িত্ব এসে পড়ে?

উত্তরঃ (১) (২) Deuteronomy'তে রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়তের পক্ষে আরও প্রমাণ-

যারা এখনও ইতিপূর্বে বাইবেল থেকে দেয়া প্রমাণগুলোর বিষয়ে সন্দিহান তাদের জন্য Deuteronomy থেকে উদ্ধৃতিগুলো দেখতে বলা হচ্ছে। সেখানে দেখা যায়-

(ক) বাইবেলে Brethren শব্দটি নিকট আত্মীয় (Consine) বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বনী ইসরাইলদের Brethren বলতে বনী ইসমাইলদের বুঝানো হয়েছে। কাজেই যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে বনী ইসরাইলদের Brethren থেকে একজন নবী আসবেন তখন এটা স্পষ্ট যে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)। কারণ মুহাম্মাদ (সাঃ) ছাড়া ইসমাইল (আঃ) এর বংশে আর কেউ নবুওয়তের দাবী নিয়ে আসেননি।

(খ) Deuteronomy'র অষ্টাদশ শ্লোকে আরও বলা হয়েছে যে ভবিষ্যত নবী হবেন মুসা (আঃ) এর সদৃশ। নীচে এ ব্যাপারে ১০টিরও বেশি প্রমাণ দেখানো হয়েছে যে, মুসা (আঃ) এর সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) এরই মিল পাওয়া যায়, ঈসা (আঃ) এর নয়।

উত্তরঃ (৩) Like unto Moses প্রসঙ্গে মুসা (আঃ) এর সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিল-

(ক) Deuteronomy'র অষ্টাদশ শ্লোক বলেছে ভবিষ্যত নবী হবেন মুসার সদৃশ এবং বনী ইসরাইলদের Brethrenদের মধ্য থেকে অর্থাৎ ইসমাইলের বংশের। মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) উভয়েই বনী ইসরাইল ছিলেন তারা কেউই ইসমাইলের বংশের ছিলেন না।

(খ) মুসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়েই তাঁদের জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে নবী হিসেবে সমর্থন পেয়েছিলেন। যা ঈসা (আঃ) পাননি।

(গ) মুসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়ের জন্ম স্বাভাবিক ছিল- অর্থাৎ তাঁদের উভয়ের পিতা-মাতা ছিলেন। তাঁদের জন্মে কোন অলৌকিকত্ব ছিল না।

(ঘ) মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) উভয়ে বিবাহিত ছিলেন। তাঁদের উভয়ের পরিবার ছিল।

(ঙ) তাঁরা উভয়ে বার্ধক্যে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

(চ) তাঁরা উভয়ে তাঁদের জাতিকে আধ্যাত্মিক এবং আইনগত দুই ক্ষেত্রেই পরিচালিত করেছেন।

(ছ) তাঁদের উভয়ের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তাঁদের জাতির অধিকাংশ মানুষ মেনে নিয়েছেন।

(জ) তাঁরা উভয়ে একাধারে নবী ও আইনদাতা ছিলেন।

(ঝ) মুসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ) দুজনেই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর উপর জয়ী হয়েছিলেন।

(ঞ) তাঁদের উভয়ের মিশন দুনিয়াতেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

(ট) তাঁদের দুজনকেই মিশনের শুরুতে তাঁদের গোত্রের ক্ষমতাসীন লোকদের চাপে দেশ ছাড়তে হয়েছে।

উত্তরঃ (৪) আল্লাহ তাঁর মুখে শব্দ পুরে দেবেন এর ব্যাখ্যা-
(God will put words in his mouth)

রাসুল (সাঃ) এর ২৩ বছরের মিশনে অংশ অংশ করে কুরআন নাজিল হয়েছে। জিবরাইল (আঃ) তাঁর কাছে যে বাণী নিয়ে আসতেন তিনি তা আল্লাহর আদেশে উচ্চারণ করতেন। 'আল্লাহ তাঁর মুখে শব্দ পুরে দেবেন' এই কথার সাথে রাসুলের জীবন এভাবেই মিলে যায়।

উত্তরঃ (৫) মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়তের পক্ষে আরও প্রমাণ-

Deuteronomy (১৮ঃ২০)তে আরও বলা হয়েছে যে যদিও কেউ নবুওয়তের দাবী করে অথচ তার করা ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে তার নবুওয়তের দাবীও মিথ্যা। পক্ষান্তরে রাসুল (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা বাস্তবে সফল হয়েছে।

উত্তরঃ (৬) এসব প্রমাণ দেখাবার পর ইহুদী-খ্রীষ্টানদের দায়িত্ব-

উপরের প্রমাণগুলো শুধু একাডেমিক আলোচনার বিষয় নয়। বরং অন্তর দিয়ে আল্লাহর দেয়া সত্য গ্রহণের পাথেয়। সত্য পথ খোঁজা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। এসব প্রমাণ মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ নবুওয়তের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করলে (বাস্তবে তাই দেখা যাচ্ছে) ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের সকল অনুসারীর কর্তব্য তাকে মেনে নেয়া। শেষ নবীর অনুসরণ করে জীবন ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করা।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) Deut ১৮ঃ১৮-২০

প্রশ্ন- (২) Gen ১৬ঃ১০-১২, ২৫ঃ১৭-১৮, Acts ৩ঃ২২

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৫৩ঃ৩-৪

প্রশ্ন- (৫) Gen ১৮ঃ১৮-২০

প্রশ্ন- (৬) Deut ১৮ঃ১৯

সি-৪ ভবিষ্যত নবীর অবস্থান প্রসঙ্গে

প্রশ্ন- (১) ভবিষ্যত নবী কোন স্থানে আবির্ভূত হবেন এ বিষয়ে বাইবেল কিছু বলেছে কি?

প্রশ্ন- (২) ফারান নামক জায়গাটি সিনাইতে অবস্থিত বলে দাবী করা হয়। সেখানে এটাকে আরবে এবং বিশেষভাবে মক্কায় বলছেন কেন?

প্রশ্ন- (৩) কুরআনে কি ইসমাইল (আঃ) এর বংশ ধারায় নবুওয়ত এবং মক্কার কোন যোগসূত্র নির্দেশক কোন উদ্ধৃতি আছে?

প্রশ্ন- (৪) Deuteronomy'র ৩৩নং অধ্যায়ের ২নং শ্লোক ছাড়া আর কোন উদ্ধৃতি বাইবেলে আছে কি, যা নবীর মক্কায় আগমনের ইঙ্গিতবাহী?

প্রশ্ন- (৫) সাধারণভাবে আরব এবং বিশেষভাবে মক্কা প্রসঙ্গে বাইবেলে কোন উদ্ধৃতি আছে কি?

উত্তরঃ (১) ভবিষ্যত নবী যে স্থানে আসবেন-

বাইবেলে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির কাছে ভবিষ্যতে যিনি নবী হিসেবে আসবেন তাঁর আগমনের স্থান হিসাবে আরব দেশের কথা বিশেষভাবে মক্কার কথা বলা হয়েছে। যেমন বেশ কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে যে ঐশী বাণীর জ্যোতি উৎসারিত হবে পারান থেকে। আরবীতে কোন প বর্ণ বা উচ্চারণ নেই। (যেমন ফিলিস্তিন কে বাইরে উচ্চারণ করা হয় প্যালেস্টাইন)। প-এর উচ্চারণ সেখানে ফ দিয়ে করা হয়। অতএব পারান শব্দের আরবী উচ্চারণ ফারান বর্তমানে আরব বলতে যে এলাকাকে বুঝানো হয় প্রাচীনকালে ফারান সেই এলাকাকেই বলা হতো। বাইবেল আরও বলে যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হাজেরা (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) অবশেষে ফারান এ নির্বাসিত জীবনে বসবাস করত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যত নবীর আবাসস্থল হচ্ছে আরবে। ইব্রাহীম (আঃ)এর প্রথম পুত্র ইসমাইল (আঃ)এর বংশে যাঁর প্রতিশ্রুত আগমন ঘটবে।

উত্তরঃ (২) ফারান অর্থ আরব সিনাই নয়-

উপরে বর্ণিত কারণ ছাড়াও ফারান যে বর্তমান আরবকেই বলা হত তার পক্ষে আরও যুক্তি আছে-

(ক) হিব্রু ভাষায় ইল ফারান মানে অভয়াশ্রম/পবিত্র আশ্রম, মক্কার কাবা ছাড়া এ ধরনের কোন জায়গা নেই। আরবীতে আল ফারান বলতে বুঝায় 'দুই পলাতক'। সম্ভবতঃ বিবি হাজেরা এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ)কে নির্জন মক্কায় নির্বাসনে দেখে পথচারিরা তাদের নিজ গোত্র থেকে পলাতক বলে মনে করেছিল।

(খ) প্রাচীন আরব ভূগোলবিদরা যে ম্যাপ তৈরী করছেন তাতে আরব ও সন্নিহিত এলাকাকে ফারান নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাজেই ফারান অর্থ সিনাই হবার প্রশ্নই

উঠে না। তাছাড়া সিনাই যদি ফারান হতো তবে সিনাই, সির এবং ফারান......
এভাবে জায়গার নামের তালিকায় সিনাই ও ফারান দুবার বলার প্রয়োজন হতো না।

উত্তরঃ (৩) কুরআনে প্রাপ্ত প্রমাণ-

বাইবেলে বর্ণিত ইসমাইল (আঃ)এর বংশে এবং আরবে নবী আসার বিষয়টি কুরআন নিশ্চিত করেছে। এ ব্যাপারে সূত্র নির্দেশিকা দেখুন। এসব সূত্রে দেখা যায় যে, ইসমাইল (আঃ) এবং তাঁর মাতা নির্বাসিত জীবনে আরবে বসত গড়েন। তাঁরা ইব্রাহীম (আঃ)সহ দোয়া করতেন যেন তাঁদের শহর এবং নির্মিতব্য আল্লাহর ঘরে যেন মানুষ এবাদতের জন্য আসে। এই ঘর হচ্ছে কাবা। যা মক্কায় অবস্থিত, সিনাইতে নয়।

উত্তরঃ (৪) আরও যেসব উদ্ধৃতি নবীর মক্কায় আসার বিষয় নিশ্চিত করে-

Habakuk এবং Isaiah-এ উল্লেখিত আছে যে নবী অত্যাচারিত হয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হবেন। অতঃপর তিনি উত্তরের 'তেমা' নামক স্থানের কাছে এক শহরে যাবেন। মদিনা শহরের ঠিক উত্তরের মরুদ্যানের নাম তেমা। আরও বলা হয়েছে সেই শহরের লোকেরা তাঁকে সাদরে বরণ করবে।

রাসুল (সাঃ) এর জন্মের হাজার বছরের বেশী আগের ওল্ড টেস্টামেন্টে যে কথা বলা হয়েছে তা তাঁর জীবনে সত্য হয়েছিল। তাঁকে অত্যাচারের মুখে মক্কা ছাড়তে হয়েছে। মদিনাবাসী তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিল। বাইবেলে আরও বলা হয়েছে যে অবশেষে নবী তাঁর সাথে দশ হাজার অনুসারিসহ তাঁর পূর্বের শহরে ফিরে আসবেন।

উত্তরঃ (৫) মক্কা নগর সম্পর্কে বিশেষ উদ্ধৃতি-

Psalms of David যার উদ্ধৃতি নীচে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে আছে। সেখানে একটি স্থানের উল্লেখ আছে যার নাম বেক্কা। বেক্কা হচ্ছে মক্কার প্রতিশব্দ, খোদ কুরআনে এই প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (৩ঃ৯৬)

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) Deut ৩৩ঃ১-৩, Gen ২১ঃ-২০-২১, ১৪ঃ৬, Hab ৩ঃ৩, Isaiah ২১ঃ১৩-১৭ Psalms ৮৪ঃ৬

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ১৪ঃ৩৭, ২ঃ১২৭-১২৮, ২ঃ১৫৮, ২২ঃ২৯, ২২ঃ৩৩, ২২ঃ২৬

সি-৫ ভবিষ্যত নবীর বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন- (১) বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ১ থেকে১১ নং শ্লোক থেকে কি তথ্য পাওয়া যায়?
প্রশ্ন- (২) Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ১নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৩) Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ২নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৪) Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ৩নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৫) Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ৪নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৬) Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ৫,৬ ও ৭নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৭) Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ৮নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৮) Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ৯ এবং ১০নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৯) Isaiah এর ৪২নং অধ্যায়ের ১১নং শ্লোকের গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ (১) Isaiah এর ৪২ন ং অধ্যায়ের ১ থেকে ১১ নং শ্লোক-
মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভবিষ্যত নবী হিসেবে আগমনের পূর্বাভাস ওল্ড টেস্টামেন্টে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে Isaiah এর উপরোক্ত শ্লোকগুলোর বর্ণনা এক অকাট্য দলিল। যাতে বিস্তৃতভাবে ভবিষ্যত নবীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য রাসুলের (সাঃ) জীবনে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

উত্তরঃ (২) ১ নং শ্লোক-
এখানে বলা হয়েছে যে, যে নবী আসবেন তিনি আল্লাহর বান্দা ও বাণীবাহক (Servant and Messanger) হিসেবে পরিচিত হবেন। মুসলমানরা কালেমা শাহাদাতে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে বলে 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহু' যার অর্থ বান্দা ও বাণীবাহক। এই শ্লোকে আরও বলা হয়েছে যার উপর ঐশী জ্যোতি আসবে তিনি হবেন খোদ স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত (Mineelect)। রাসুল (সাঃ) এর উপাধি ছিল আল মুস্তাফা অর্থাৎ The elect.

উত্তরঃ (৩) ২ নং শ্লোক-
এটা বলা হয়েছে যে, যিনি আসবেন তিনি সদয় ব্যবহার দিয়ে সুন্দরভাবে তাঁর মিশন চালাবেন। তিনি নিরুৎসাহিত হবেন না এবং ব্যর্থ হবেন না। রাসুল (সাঃ) তাঁর মিশন শেষ পর্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত করেন। তিনি কখনও উৎসাহ হারাননি। তাঁর ব্যবহার ছিল সর্বমহল প্রশংসিত। নিষ্ঠার সাথে তিনি দায়িত্বপালন করেন।

উত্তরঃ (৪) ৩ নং শ্লোক-
এখানে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যত নবী 'ভাঙা বাঁশী' ভাংবেন না। একথা দিয়ে মিশরের সাথে রাসুল (সাঃ) এর ব্যবহারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি এমন চুক্তি করেন যা সমগ্র মিশরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, এমনকি সেন্ট ক্যাথারিন এর গীর্জার খ্রীষ্টানদেরও। এই

শ্লোকে আরও আভাষ দেয়া হয়েছে যে তিনি রোম এবং পারস্যের অত্যাচারী স্বৈরাচারী দুঃশাসন থেকে নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করবেন।

উত্তরঃ (৫) ৪ নং শ্লোক-

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যত নবী শুধু ওহী প্রচারই করবেন না তিনি বিচার করবেন ও শাসন করবেন। রাসুল (সাঃ) ছিলেন একাধারে দ্বীন প্রচারক, বিচারক এবং শাসক। মুসা (আঃ), দাউদ (আঃ) এবং সোলায়মান (আঃ) এর পর আর কোন নবীর মধ্যে এত সব বৈশিষ্ট্য একসাথে দেখা যায়নি।

উত্তরঃ (৬) ৫, ৬ ও ৭ নং শ্লোক-

এসব শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নবী আল্লাহর অনুগ্রহে মানুষকে দৃষ্টি দেবেন, অন্ধকার থেকে আলোতে আনবেন। রাসুল (সাঃ) এর আগমনের সময় আরবে যে অন্ধকার পাপে পূর্ণ জীবন ছিল এখানে তারই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। রাসুল (সাঃ) লোকদের সত্যিকার দ্বীনের আলো দেখিয়ে তাদের পথে আনেন। সত্য দ্বীন চিনতে পেরে তারা যেন অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরে পায়। কুরআন এটাকে বলেছে, "এটা একটি কিতাব যা আমি তোমার উপর নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের জমাট বাঁধা অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসো।"

উত্তরঃ (৭) ৮ নং শ্লোক-

এখানে বলা হয়েছে যে, সেই শেষ নবীর পর আর কাউকে তাঁর মত সেই সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে না। এটা সময়ের পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, রাসুলের (সাঃ) মত সম্মান মর্যাদা আর কেউ কখনও পায়নি। তাঁর জীবনাবসানের পর নবুওয়তের অকাট্য দাবী ও প্রমাণ নিয়েও আর কেউ বিশ্বজনীনভাবে দাঁড়াতে পারেনি।

উত্তরঃ (৮) ৯ এবং ১০ নং শ্লোক-

আসন্ন নবী যে একটি নতুন কিতাব আনবেন তার কথা এখানে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে স্রষ্টার নামে এক নতুন গীত গাওয়া হবে। কুরআন আরবীতে নাজিল হয়েছে এবং এটা আজ দেড় হাজার বছর ধরে সব মুসলমানদের দ্বারা দিনে পাঁচ বার নামাজে গীত হচ্ছে।

উত্তরঃ (৯) ১১ নং শ্লোক- এই শ্লোকে ভবিষ্যত নবীর আগমনস্থলকে সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে-

এখানে আভাষ দেয়া হয়েছে যে শেষ নবী কেদার (Kedar)-এর আবাসের কাছে আবির্ভূত হবেন। এই কেদার হচ্ছেন ইসমাইল (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র যিনি ফারানে (আরবে) বসতি গড়েন। ইসমাইল (আঃ) এর বংশে মুহাম্মদ (সাঃ)ই একমাত্র যিনি যৌক্তিক এবং সফলভাবে নবুওয়তের দাবী নিয়ে আবির্ভূত হন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, এই এগারটি শ্লোকে বর্ণিত মানুষটি রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) Isaiah ৪২ঃ১-১১

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ১৬ঃ১২৫, ২৯ঃ৪৬, ৪ঃ১৪৮, ৩১ঃ১৯

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ৪ঃ১৭৩, ১৪ঃ১

সি-৬ বাইবেলে কুরআন ও কাবার প্রসঙ্গ

প্রশ্ন- (১) ইতিমধ্যে উল্লিখিত উদ্ধৃতি ছাড়া বাইবেলে আর কোন ইঙ্গিত আছে কি যাতে বোঝা যায় আলোচ্য ভবিষ্যত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)।

প্রশ্ন- (২) ভবিষ্যত নবী যে শুধু নবীই হবেন না বরং রাষ্ট্রপ্রধানও হবেন এ বিষয়ে আর কোন উদ্ধৃতি আছে কি?

প্রশ্ন- (৩) ভবিষ্যত নবীর কাছে কিভাবে ওহী আসবে সে বিষয়ে বাইবেলে কিছু বলা হয়েছে কি?

প্রশ্ন- (৪) ভবিষ্যত নবী যে এলাকায় আসবেন তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বাইবেল কিছু জানিয়েছে কি?

প্রশ্ন- (৫) ভবিষ্যত নবীর নাম সম্পর্কে বাইবেলে কোন ইঙ্গিত আছে কি?

উত্তরঃ (১) বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যত নবী যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষে আরও প্রমাণ-

বাইবেলের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাইবেল অকাট্যভাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছে। যেমন- Encyclopaedia Biblica মতে Isaiah-এর একাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দেখা যায় যে, নবী Jesse-এর বংশে আসবেন। এই Jesse হচ্ছে ইসমাইল (আঃ)-এর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। কাজেই উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে একজন আল্লাহর ওহী (Spirit অর্থাৎ কুরআন) লাভ করবেন এবং এর সাহায্যে তিনি নবী এবং শাসক হবেন। এখানে এটাও বলা হয়েছে যে তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল হবে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। এই তিনটি বিষয়ই রাসুল (সাঃ)-এর জীবনে সফল হয়েছিল। তিনি ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে আগমন করেছিলেন, আল্লাহর ওহী লাভ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্র প্রধান হয়েছিলেন। আর প্রতি বছর সারা বিশ্বের কয়েক মিলিয়ন মানুষ তাঁর কবর জেয়ারত করে। যে সম্মান, মর্যাদা ও জিয়ারত এই বিশ্বের আর কারো সমাধিস্থল পায়নি।

উত্তরঃ (২) ভবিষ্যত নবী যে রাষ্ট্র প্রধানও হবেন এর পক্ষে দলিল-

বাইবেলে ভবিষ্যত নবীর মিশনের প্রকৃতি এবং তিনি যেসব সাফল্য অর্জন করবেন তা এত পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যা সন্দেহাতীতভাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সাদৃশ হয়। Isaiah-এর নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভবিষ্যত নবীর কাঁধে থাকবে রাষ্ট্রক্ষমতা, তিনি আঁধার যুগের অশিক্ষিত মানুষকে আলোকিত করবেন এবং তিনি পৃথিবীতে পরাক্রমশালী হবেন। রাসুল (সাঃ) রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন। আরও বলা হয়েছে তাঁর নেতৃত্বে অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ প্রতিপত্তির সাথে দাঁড়াবে এবং পৃথিবীকে পরিমাপ করবে। রাসুল (সাঃ) তাঁর অনুসারী যারা ছিল সেই সমাজের নির্যাতিত অবহেলিত তাদের নিয়ে অত্যাচারীদের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন।

উত্তরঃ (৩) নবীর কাছে কিভাবে ওহী আসবে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী-

ভবিষ্যত কিতাবটি যে আল কুরআন হবে এ আভাস বাইবেলে দেয়া হয়েছে। Isaiah-এ ২৮ এবং ২৯ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে ওহী আসবে। আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ খন্ড খন্ড করে নাজিল হবে। কুরআন নাজিলের ধারা লক্ষ্য করলে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা দেখা যায়। ওহীর মাধ্যমে কুরআনের আয়াত শুনবার পর রাসুল (সাঃ) তা বারবার উচ্চারণ করতেন। অনেকটা থেমে থেমে (Stammering) মত। এই কথাও বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে এসেছে।

উত্তরঃ (৪) নবী যে এলাকায় আসবেন তার ভৌগোলিক অবস্থান প্রসঙ্গে-

কোন এলাকায় নবী আসবেন তার অবস্থান এবং তা কিভাবে গড়ে উঠবে এবং তার আগমনের কারণে সে এলাকা পবিত্র ভূমিতে পরিণত হবে তার উল্লেখও সফলভাবে বাইবেলে এসেছে রাসুল (সাঃ)-এর আগমনের কয়েক শত বৎসর আগে। এভাবে বেক্কা (মক্কার প্রতিশব্দ)-এর নাম এসেছে। এক নতুন জেরুজালেম এর অভ্যুদয় এর কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মক্কার পূর্বে জেরুজালেমই ছিল কেবলা।

উত্তরঃ (৫) বাইবেলে নতুন নবীর নাম সম্পর্কে ইঙ্গিত-

Song of Solomon-এ একজনের নাম উল্লেখিত আছে যিনি হবেন সার্বিকভাবে প্রেমময় Altogeher Lovely। এ ব্যাপারে মূল যে হিব্রু শব্দটি এসেছে তা হচ্ছে Mohamoudim ইহুদী এনসাইক্লোপিডিয়া মতে Im প্রত্যয় যে কোন শব্দের শেষে মাহাত্ম্য মর্যাদা বাড়াতে ব্যবহৃত হয়। কাজেই Mohamoudim থেকে Im বাদ দিলে থাকে Mohamoud, যা কিনা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নামের সাথেই মিলে।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) Isaiah ১১ঃ১

প্রশ্ন- (২) Isaiah ৯ঃ২-৭, Hab ৩ঃ১-৭

প্রশ্ন- (৩) Isaiah ২৯ঃ১২, ২৮ঃ১০-১১, ১৭ঃ১০৬, Psalms ১২ঃ৬-৭

প্রশ্ন- (৪) Gai ৪ঃ২৫ Isaiah ৫২ঃ১, ৫৬ঃ৭-৮, ২ঃ১২৫

প্রশ্ন- (৫) Isaiah ৫ঃ১৬

আরও দেখুন The Encyclopaedia Biblica

সি-৭ ভবিষ্যত নবীর আগমন সম্পর্কে নিউ টেস্টামেন্ট

প্রশ্ন- (১) কুরআনে কি কোন উদ্ধৃতি আছে যাতে দেখা যায় স্বয়ং ঈসা (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

প্রশ্ন- (২) নিউ টেস্টামেন্টের কোথায় মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে?

প্রশ্ন- (৩) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন নির্দেশক বাইবেলের এসব ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীস্টান বিশেষজ্ঞরা অনুধাবনে ব্যর্থ হলেন কেন?

প্রশ্ন- (৪) ঈসা (আঃ) বর্ণিত প্যারাক্লিট/প্যারাক্লিটাস (Paraclete/Paracletus) যে মানুষ ছিলেন, কোন ফেরেশতা ছিলেন না তা কিভাবে নিশ্চিত হবেন?

প্রশ্ন- (৫) ঈসা (আঃ) বর্ণিত প্যারাক্লিট যে আরেকজন নবীই হবেন, জিব্রাইল (আঃ) নয়– এমন দাবীর পক্ষে আর কি প্রমাণ আছে?

প্রশ্ন- (৬) ঈসা (আঃ) বলেছেন যে ভবিষ্যত মুক্তিদাতা (Comforter) ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের সত্য পথ দেখাবেন এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে বলবেন। রাসুল (সাঃ)-এর জীবনে এমন উদাহরণ আছে কি?

প্রশ্ন- (৭) ঈসা (আঃ) বলেছেন যে প্যারাক্লিট চিরজীবি হবেন, অথচ মুহাম্মদ (সাঃ) প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন এ ব্যাপারে মুসলমানদের ব্যাখ্যা কি?

প্রশ্ন- (৮) ঈসা (আঃ) বলেছেন যে, মুক্তিদাতা তাঁকে সত্যায়িত, সম্মানিত ও মর্যাদাবান করবেন। রাসুল (সাঃ) এর কাজে কি এর প্রতিফলন ঘটেছে?

প্রশ্ন- (৯) প্যারাক্লিট বিষয়ে মুসলমানদের ব্যাখ্যার পক্ষে আর কোন যুক্তি আছে কি?

উত্তরঃ (১) কুরআন মতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী-

কুরআনে এবং হাদীসে উল্লেখিত আছে যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে ঈসা (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (সূত্র দেখুন)।

উত্তরঃ (২) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে নিউ টেস্টামেন্ট-

নিউ টেস্টামেন্টে ঈসা (আঃ) ভবিষ্যতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে বলেছেন। এ বিষয়ে John, 1st Epistle, Acts এ উল্লেখ আছে।

উত্তরঃ (৩) বাইবেলের এসব ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীস্টান বিশেষজ্ঞরা যে কারণে অনুধাবনে ব্যর্থ হলেন-

নিউ টেস্টামেন্টে ঈসা (আঃ) ভবিষ্যতে প্যারাক্লিট (Paraclete) অর্থাৎ মুক্তিদাতা (Comforter Counsellor Admonisher)-এর আগমনের আভাষ দিয়েছেন। এই প্যারাক্লিট-এর অর্থ খ্রীস্টান পণ্ডিতরা মনে করেছেন জিবরাইল (আঃ)। কিন্তু আমাদের মতে এর অর্থ মুহাম্মদ (সাঃ)। তার কারণ পরের প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করছি।

উত্তরঃ (৪) ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যক্তিটি জিবরাইল (আঃ) নয় কেন?

(ক) বাইবেল থেকে এটা স্পষ্ট যে প্যারাক্লিট হবেন এমন ব্যক্তি যিনি পূর্বে আর আসেননি। অথচ জিবরাইল (আঃ) সব নবীর কাছেই আল্লাহর ওহী নিয়ে আসতেন।

(খ) Dictionary of the Bible-এর ১৯৬৫ সালের সংস্করণে লেখক বলেছেন যে প্যারাক্লিট-এর বৈশিষ্ট্য জিবরাইল (আঃ)-এর সাথে মিলে না।

(গ) প্রথম দিকের খ্রীস্টানরা প্যারাক্লিট-এর দাবীদার বিভিন্ন মানুষের অনুসরণ করত। এতে প্রমাণিত হয় যে তারা জানত যে প্যারাক্লিট হবেন মানুষ।

(ঘ) Interpreters Dictionary of the Bible-এর ৬৫৪ ও ৬৫৫ নং পৃষ্ঠায় প্যারাক্লিট এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁকে একজন পুরুষ বলা হয়েছে। তিনি মানবতার মুক্তিদাতা হিসেবে আসবেন। কিন্তু ফেরেশতারা পুরুষ বা নারী কোনটাই নন।

উত্তরঃ (৫) আসন্ন ব্যক্তি যে নবীই হবেন Holyghost নন এর স্বপক্ষে আরো দলিল-

(ক) John-এ আছে যে প্যারাক্লিট নিজ থেকে কিছু বলবেন না। প্রভূর কথাই তিনি বলবেন। এতে দেখা যাচ্ছে প্যারাক্লিট আল্লাহর কাছে থেকে জ্ঞান পাবেন। কিন্তু Holyghost তে ত্রীত্ববাদ মতে খোদায়ীর অংশ, কাজেই Holyghost কোনভাবেই প্যারাক্লিট নন।

(খ) রাসুল (সাঃ) নিজেই বলেছেন যে আল্লাহর কাছ থেকে তিনি ওহী লাভ করেন। কুরআনের প্রতিটি সুরা আল্লাহর নামে শুরু হয়েছে কাজেই প্যারাক্লিট নিজ থেকে কিছুই করবেন না বরং প্রভূর কথাই পড়ে শোনাবেন– এই কথা রাসুল (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে মিলে যায়।

(গ) ঈসা (আঃ) বলেছেন যে প্যারাক্লিট তাঁর পরে আসবেন। বস্তুতঃ তাঁর পরে মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কেউ নবুওয়তের দাবি নিয়ে আসেননি।

উত্তরঃ (৬) মুহাম্মদ (সাঃ) কি ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের সত্য পথ দেখান এবং সফল ভবিষ্যদ্বাণী করেন-

কুরআন মতে রাসুল (সাঃ)-এর অন্যতম মিশন ছিল ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের সুপথে আনা। ঈসা (আঃ) যে একজন নবী ছিলেন তাদের তা বোঝানো। মুহাম্মদ (সাঃ) সাফল্যের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কিছু স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যার প্রতিটিই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

উত্তরঃ (৭) প্যারাক্লিট-এর চিরজীবি হওয়া প্রসঙ্গে-

শারীরিকভাবে কোন মানুষই চিরঞ্জীব হতে পারেন না। কিন্তু রাসুল (সাঃ)-এর শিক্ষা আজ দেড় হাজার বছর পরও অবিকৃত অক্ষত আছে। কেয়ামত পর্যন্ত তা অক্ষত থাকবে। অতএব রাসুল (সাঃ) এই অর্থে চিরঞ্জীব। কাজেই "প্যারাক্লিট চিরঞ্জীব– অতএব রাসুল (সাঃ) প্যারাক্লিট হতে পারেন না"- এ ধরণের খ্রীস্টান মতবাদ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তরঃ (৮) (৯) রাসুল (সাঃ) কি ঈসা (আঃ)কে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন?
ঈসা (আঃ)-এর প্যারাক্লিট সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রাসুল (সাঃ)-এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছিলেন যে, নতুন নবী তাঁকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করবেন। বাস্তবে দেখা যায় কুরআন এবং হাদীসে ঈসা (আঃ)কে কত উচ্চ সম্মান দেয়া হয়েছে। এমনকি বাইবেলের চেয়েও তাঁকে বেশি মহান করে কুরআন উপস্থাপন করেছে। কারণ বাইবেলে উল্লেখ আছে যে যীশু মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।

সূত্র নির্দেশিকাঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৬১ঃ৬

জনগণ রাসুল (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করেছিলো তাঁর রাসুল হিসেবে আগমণের কারণ প্রসঙ্গে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমার আগমন ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করতে।

প্রশ্ন- (২) Jahn ১৪ঃ১৫-১৮, ১৫ঃ২৬-২৭, ১৬ঃ ৭-১৫, 1st Epist ২ঃ১

প্রশ্ন- (৩) Acts ২ঃ১২ঃ১৩

প্রশ্ন- (৫) আলকুরআন ৫৩ঃ৩-৫, ৭ঃ২০৩

প্রশ্ন- (৬) আলকুরআন ১৬ঃ৮৯, ৫ঃ৩

প্রশ্ন- (৮) Matt ২৭ঃ৪৬, ১২ঃ৪৭-৪৮, ২৩ঃ৩১-৩৩, ১৯ঃ৩০-৩১

আরো দেখুন The Dictionary of the Bible, Interpreter's Dictionary of the Bible.

সি-৮ ভবিষ্যত নবী সম্পর্কে নিউ টেস্টামেন্ট (চলমান)

প্রশ্ন- (১) গ্রীক শব্দ প্যারাক্লিট এর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা কি?

প্রশ্ন- (২) প্যারাক্লিটাস প্রসঙ্গ ছাড়া মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াত সম্পর্কে আর কোন পূর্বাভাস বাইবেলে আছে কি?

প্রশ্ন- (৩) একজন মুসলমানের পক্ষে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করাটা আদৌ কতটা যুক্তিসঙ্গত?

প্রশ্ন- (৪) ইসমাইল (আঃ) এর বংশে নবী আসার বিষয়টি বাইবেলে কি ভাবে এসেছে?

প্রশ্ন- (৫) মুসা (আঃ)-এর সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কি কি মিল আছে?

প্রশ্ন- (৬) ভবিষ্যত নবী যে আরবেই আসবেন এমন কোন উল্লেখ বাইবেলে আছে কি?

প্রশ্ন- (৭) এমন কথা কি বাইবেলে উল্লেখিত আছে যে ভবিষ্যত নবী একজন দেশ শাসকও হবে?

প্রশ্ন- (৮) ভবিষ্যত নবী কিভাবে অহি পাবেন বলে বাইবেল উল্লেখ করেছে? এই উদ্ধৃতির সাথে রাসুল (সাঃ)-এর কি মিল দেখা যায়?

প্রশ্ন- (৯) রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার পূর্বাভাস বাইবেলে আছে কি?

প্রশ্ন- (১০) ইসরাইল বংশ থেকে নবুওয়াত ইসমাইলের বংশে স্থানান্তরিত হবে নিউ টেস্টামেন্টে এমন কিছু উল্লেখ আছে কি?

উত্তরঃ (১) প্যারাক্লিট শব্দের অর্থ-

গ্রীক শব্দ প্যারাক্লিট এর অর্থ এমন কেউ যিনি মানুষকে সতর্ক করবেন, পরামর্শ এবং প্রশান্তি দেবেন। প্যারাক্লিট শব্দের কাছাকাছি অর্থের আর একটি শব্দ গ্রীক ভাষায় আছে তা হচ্ছে প্যারাক্লিটাস। এর অর্থ সম্মানিত বা প্রশংসিত বা প্রশংসার যোগ্য। এ শব্দের আরবী অনুবাদ হচ্ছে 'আহমাদ'। আর এটা বেশ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করার বিষয় যে রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর আরেক নাম 'আহমাদ'।

উত্তরঃ (২) প্যারাক্লিট প্রসঙ্গ ছাড়াও রাসুল (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে আর যেসব পূর্বাভাস পাওয়া যায়-

John এর প্রথম অধ্যায়ের ১৯ থেকে ২৫ নং শ্লোকে দেখা যায় যে সাধু পুরুষরা জন দি ব্যাপটিস্ট (আঃ) এর কাছে যান এবং তাঁরা তিনজন নবীর আগমনের প্রত্যাশা করছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ইলিয়াস (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ)।

উত্তরঃ (৩) মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়ত সম্পর্কে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি নেয়া প্রসঙ্গে-

মুসলমানরা আল্লাহর দেয়া সব কিতাব বিশ্বাস করে। যদিও মূল ইঞ্জিলের অনেক বিকৃত বাইবেলে ঘটেছে। তবুও মূল ইঞ্জিলের বেশ কিছু অংশ অক্ষত রয়ে যেতে পারে। কাজেই

কুরআনের সাপেক্ষে তুলনা করে বাইবেল থেকে যে কোন বিষয়ে উদ্ধৃতি নেয়া যেতে পারে। এতে কোন দূষনীয় কিছু নেই।

উত্তরঃ (৪) ইসমাইল (আঃ) এর বংশেই যে ভবিষ্যত নবী আসবেন তার প্রমাণ-

(ক) তাওহীদবাদীদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই পুত্রের বংশে নবী দিয়ে তাঁদের রহমত করার প্রতিশ্রুতি সাধারণভাবে আল্লাহ্ দিয়েছিলেন।

(খ) এছাড়া আলাদা করে সুনির্দিষ্টভাবে ইসমাইল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ) উভয়কে তাঁদের বংশে নবী দেয়ার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছেন।

(গ) ইতিহাসে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটেছে। ইসহাক (আঃ)-এর বংশে সকল বনী ইসরাইলী নবীরা এসেছেন। আর ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে মুহাম্মদ (সাঃ) এসেছেন।

(ঘ) Isaiah-তে জেসিকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে তাঁর বংশে নবী দেয়া হবে। জেসি হচ্ছে ইসমাইল (আঃ)-এর নামেরই সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ।

উত্তরঃ (৫) মুসা (আঃ) এর সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিল প্রসঙ্গে-

মুসা (আঃ) এর সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মিল থাকার প্রসঙ্গে দশটিরও বেশী যুক্তি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাইবেলে বলা হয়েছিল যে আসন্ন নবী হবেন মুসা (আঃ)-এর মত। বস্তুতঃ মুসা (আঃ)-এর সাথে রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অসংখ্য মিল পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মুসা (আঃ)-এর জীবন ও মিশন এবং তাঁর পরিণতির সাথে ঈসা (আঃ)-এর কোন মিল লক্ষ্য করা যায় না ।

(সি-৩ -এর আলোচনা দেখুন)

উত্তরঃ (৬) বাইবেলে ভবিষ্যত নবী আরবেই আসবেন এমন উল্লেখ প্রসঙ্গে-

বাইবেলে পারান, কেদার, বেক্কা এসব স্থানের উল্লেখ আছে যা স্পষ্টভাবে আরব এবং মক্কাকেই ইঙ্গিত করে।

উত্তরঃ (৭) 'ভবিষ্যত নবী দেশ শাসকও হবেন' বাইবেলের এমন উক্তি প্রসঙ্গে-

বাইবেলে শেষ নবীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাঝেই এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন তাঁর উপাধি ছিল আল্লাহর বান্দা ও বাণীবাহক (রাসুল)। তাঁর প্রচারিত বিশ্বাস বিশ্বজনীন হয়েছে। তিনি এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধৈর্য্যের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হন।

(সূত্র দেখুন)

উত্তরঃ (৮) রাসুল (সাঃ) যেভাবে ওহী লাভ করতেন-

রাসুল (সাঃ)-এর ওহী লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে বাইবেলে অকাট্য সত্য দলিল আছে। (সূত্র দেখুন)। ইতিহাস থেকে জানা যায় রাসুল (সাঃ) ছিলেন নিরক্ষর। জিব্রাইল (আঃ)-এর আনীত বার্তাই তিনি পড়তেন যার উল্লেখ বাইবেলে আছে। এমনকি কুরআনের প্রতিটি অধ্যায় আল্লাহ্র নামে শুরু হবে তার উল্লেখও বাইবেলে আছে। আল্লাহর ওহী ভুলে যাবার ভয়ে রাসুল (সাঃ) তা বার বার থেমে থেমে উচ্চারণ করবেন এমন ইঙ্গিতও বাইবেল দিয়েছে।

উত্তরঃ (৯) রাসুল (সাঃ) জীবনের কিছু ঘটনা সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী-

Isaiah এবং Habbakuk-এ উল্লেখিত আছে যে ভবিষ্যত নবী তাঁর নিজ দেশত্যাগে বাধ্য হবেন। তিনি উত্তরের এক শহরে যাবেন যার অধিবাসীরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবেন। রাসুল (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরত এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করে। উল্লেখ্য যে মদীনা নগরী মক্কার উত্তরে অবস্থিত।

Deut-এ আছে যে নবী 'ফারান' এর পর্বত থেকে ১০,০০০ সাধকসহ এগিয়ে আসবেন। হিজরতের দশ বছর পর ১০,০০০ সাহাবাসহ বিজয়ীর বেশে রাসুলের মক্কা প্রবেশের সুন্দর ইঙ্গিত বাইবেলে এভাবেই পাওয়া যায়।

উত্তরঃ (১০) নবুওয়তের দায়িত্ব ইসরাইল বংশ থেকে ইসমাইল বংশে স্থানান্তরিত হবে এ বিষয়ে নিউ টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতি-

ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট দুটোতেই বনী ইসরাইলদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে তারা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করলে তাদের কাছ থেকে নবুওয়ত কেড়ে তাদের ইসমাইলী ভাইদের দেয়া হবে।

সূত্র নির্দেশিকা

প্রশ্ন- (২) John ১ঃ১৯-২৫ Deut ১৮ঃ১৮

প্রশ্ন- (৪) Isaiah ১১ঃ১-২

প্রশ্ন- (৬) Deut ৩৩ঃ১-৩, Psalm ৮৪ঃ৬

প্রশ্ন- (৭) Isaiah ৪২ঃ১-১১

প্রশ্ন- (৮) Deut ১৮ঃ১৮-২০ Deut ২৮ঃ৯-১১ Isaiah ২৯ঃ১১-১৩

প্রশ্ন- (৯) Isaiah ২১ঃ১৩-১৭, Deut ৩৩ঃ১-৩, Hab ৩ঃ৩

প্রশ্ন- (১০) Deut ১৮ঃ১৮

প্রশ্ন- (১১) Jer ৩১ঃ৩৬, Matt ২১ঃ৪৩

ডি-১ ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

প্রশ্ন- (১) ইসলামে ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি কি?

প্রশ্ন- (২) কুরআন এবং হাদীসে ফেরেশতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? তাদের কি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

প্রশ্ন- (৩) ফেরেশতাদের কখন সৃষ্টি করা হয়েছে এ বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয়েছে কি?

প্রশ্ন- (৪) ফেরেশতা বলতে নিষ্পাপ সত্তা বুঝায়। তাহলে ফেরেশতারা কি মানুষের চেয়ে উত্তম সৃষ্টি?

প্রশ্ন- (৫) দ্বিতীয় সূরার ৩৩-৩৪ আয়াতে দেখা যায় আল্লাহ্ ফেরেশতাদের আদম (আঃ)কে সেজদার আদেশ করলে শয়তান সে আদেশ অমান্য করে- সব ফেরেশতা আল্লাহর আদেশ পালনে বাধ্য হলে শয়তান কেন আদম (আঃ) কে সেজদা করল না? শয়তান কি ফেরেশতা ছিল?

প্রশ্ন- (৬) ফেরেশতা কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? তাদের কি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে?

প্রশ্ন- (৭) ফেরেশতাদের চেহারার প্রকৃতি কেমন? তারা মানুষের রূপে আসতে পারে?

প্রশ্ন- (৮) ফেরেশতাদের সাথে মানুষের কি সম্পর্ক?

প্রশ্ন- (৯) মুসলমানদের ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের বাস্তব কোন প্রয়োগ আছে কি?

উত্তরঃ (১) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি-

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক অংশ। তাওহীদ এবং রেসালাতে বিশ্বাসের মতই ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সরাসরি আদেশ আছে।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে তথ্যের উৎস-

ফেরেশতাদের প্রকৃতি, কাজ, মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানবার আগে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। মানুষের দৃষ্টি, শ্রবণ শক্তি ও চিন্তার সীমার মধ্যেই আল্লাহ্ পাকের বিশাল সৃষ্টি জগৎ সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মহান সৃষ্টি জগতের মধ্যে অদেখা বা গায়েবী জগৎ নামে এক বিশাল জগৎ আছে। মানুষের সীমাবদ্ধ অনুভূতি বা বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল প্রয়োগ করেও যা সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। এই জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস আধ্যাত্মিক ওহী। আল্লাহর ওহীর সর্বশেষ সংস্করণ কুরআন থেকেই আমরা এই জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি।

উত্তরঃ (২) (৩) (৪) (৫) ফেরেশতাদের প্রকৃতি, গঠন ও চরিত্র-

কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতারা কোন দেহধারী সত্তা নয়। মানুষকে কাদা থেকে তৈরী করা হয়েছে, জ্বীনকে আগুন থেকে তৈরী করা হয়েছে। ফেরেশতাদের সম্ভবত আলো (নূর) থেকে তৈরী করা হয়েছে। আলো থেকে তৈরী হবার কারণে এটা অনুমিত হয় যে, পাপ তাদের স্পর্শ করবে না এবং মানুষের চেয়ে তারা অধিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। যদিও ফেরেশতারা ভুল ও পাপের উর্ধ্বে তবুও তারা আল্লাহর কাছে মানুষের চেয়ে বড় নয়। কারণ

ফেরেশতাদের এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে তাদের কোন ভুল হতে পারে না। অন্যদিকে শয়তানের তীব্র কুমন্ত্রণা মোকাবেলা করে অন্যায় করার স্বাধীনতা থাকার পরও মানুষ যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করে। যা অত্যন্ত কঠিন। কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আদম (আঃ) কে সেজদা দিতে ফেরেশতাদের আদেশ করেন। কারণ আদম (আঃ) কে এমন জ্ঞান দেয়া হয়েছিল যা ফেরেশতাদের ছিল না। শয়তান প্রকৃতভাবে ফেরেশতা ছিল না এ কারণেই তার পক্ষে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা সম্ভব হয়েছে।

উত্তরঃ (৬) (৭) (৮) ফেরেশতাদের কাজ ও মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক-

কুরআন ও হাদীস থেকে ফেরেশতাদের কাজ ও মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে নিম্নলিখিত শিক্ষা পাওয়া যায়ঃ

(ক) সার্বক্ষনিকভাবে আল্লাহর এবাদত ও জিকির করা।
(খ) আল্লাহর ওহী বহন করা।
(গ) প্রত্যেক মানুষের সাথে থেকে তার কাজকর্মের হিসাব রাখা।
(ঘ) মানুষকে ভাল কাজ করতে ও শয়তানের কাছ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা।
(ঙ) ধার্মিক লোকের ঘনিষ্ঠ থাকা।
(চ) বিশ্বাসীদের বিপদের সময় সাহায্য করা।
(ছ) বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

উত্তরঃ (৯) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের বাস্তব প্রয়োগ-

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের কারণে মানুষ ভাল বা মন্দ কাজের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। কারণ তারা চাইবে যেন তাদের আল্লাহ এবং তাঁর সম্মানিত এই সহযোগিরা কেউ তাদের কাজে অসন্তুষ্ট না হোন।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৩২ঃ৭, ১৫ঃ২৭, ৫৫ঃ১৫, ৬৬ঃ৬, ১৬ঃ৪৯-৫০, ২১ঃ২৬-২৯, ৭ঃ২০৬
প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ২ঃ৩০
প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ২ঃ৩১-৩৪
প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ১৮ঃ৫১
প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ২৬ঃ১৯৩-৪, ১৬ঃ১০২
প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ১১ঃ৬৯-৭৩, ১৯ঃ১৬-১৭
প্রশ্ন- (৮) আল কুরআন ৮২ঃ১০-১২, ৪৩ঃ৭৯-৮০, ৫০ঃ১৬-১৮, ১৭ঃ১৩-১৪, ১৭ঃ৭৮, ৪১ঃ৩০, ৮ঃ১০-১২, ৪০ঃ৭, ৩৩ঃ৪৩
প্রশ্ন- (৯) আল কুরআন ২ঃ১৭৭, ২ঃ২৮৫

ডি-২ জ্বীনের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে

প্রশ্ন- (১) ফেরেশতা ছাড়া আর কোন অদেখা সৃষ্টির অস্তিত্বে মুসলমানরা বিশ্বাস করে কি?

প্রশ্ন- (২) জ্বীনের প্রকৃতি কি? জ্বীনদের কি থেকে তৈরী করা হয়েছে?

প্রশ্ন- (৩) সব জ্বীনই কি শয়তানে পরিবর্তিত হয়?

প্রশ্ন- (৪) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শয়তান কিভাবে জড়িত?

প্রশ্ন- (৫) শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয়েছে কি?

প্রশ্ন- (৬) এটা কি সত্যি যে, শয়তান মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না?

প্রশ্ন- (৭) কোন কোন অবস্থা ও প্রেক্ষিতে শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করার সুযোগ পায়?

প্রশ্ন- (৮) জ্বীন জাতিকে কেন তৈরী করা হয়েছে?

উত্তরঃ (১) অদেখা সৃষ্টিতে বিশ্বাস প্রসঙ্গে-

আল্লাহ সৃষ্টি জগৎকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়–

দেখা জগৎ (Seen)	অদেখা জগৎ (Unseen)
(মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী)	(জ্বীন ও ফেরেশতা)
মানুষের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী আছে	জ্বীনের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী আছে

মানুষ এবং জ্বীন উভয় জাতির বিশ্বাসীরা ফেরেশতার মত।

মানুষ এবং জ্বীন উভয় জাতির অবিশ্বাসীরা শয়তানের অনুসারী।

উত্তরঃ (২) (৩) জ্বীন এর প্রকৃতি-

মুসলমানরা জ্বীন জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, জ্বীন হচ্ছে এমন সৃষ্টি যাদের দেখা যায় না। কারণ তাদের ধোয়াহীন আগুন থেকে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু জ্বীন শব্দটি শয়তান বা তার সহযোগিদের প্রতিশব্দ নয়। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, জ্বীনরা মানুষের মতই আরেকটি জাতি। মানুষের মতই ভাল বা মন্দ যে কোন একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তাদের কেন তৈরী করা হয়েছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। এটা অনুমিত হয় যে, মানুষকে পরীক্ষা করার কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়। যেখানে ফেরেশতারা মানুষকে ভাল কাজের দিকে ডাকে সেখানে অবিশ্বাসী জ্বীন মানুষকে খারাপের মন্ত্রণা দেয়।

উত্তরঃ (৪) (৫) মানুষের জীবনে শয়তান ও তার কুমন্ত্রনা প্রতিরোধের উপায়-

যে কোন খোদাদ্রোহী ব্যক্তি বা শক্তিকে মুসলমানরা শয়তান নামে অভিহিত করে। জ্বীনের সর্দার ইবলিস আদম (আঃ) কে সেজদা করা সংক্রান্ত আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই তার নাম শয়তান রাখা হয়। ফেরেশতারা মানুষকে সুপথে চালিত করে। আর শয়তান ইবলিশ ও তার দলভুক্ত জ্বীন এবং অবিশ্বাসী মানুষরা সাধারণ মানুষকে খারাপ কাজে উৎসাহ দেয়। শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে করণীয়–

(ক) শয়তানকে শত্রু মনে করে তার থেকে দূরে থাকা। এ জন্যে কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়া উচিৎ।

(খ) সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিৎ। কারণ শয়তান সব সময় খারাপ অশ্লীল বিষয়গুলোকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে উপস্থাপন করে। শয়তানের এসব অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে এগুলোকে সমাজ থেকে দূরে রাখতে হবে।

উত্তরঃ (৬) শয়তানের শক্তি-

শুধুমাত্র যারা নিজেদের মাঝে শয়তানকে কাজ করতে দেয় তাদের উপরই শয়তান প্রভাব খাটাতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা আল্লাহর পথ ও শয়তানের পথ যাচাই করবার মত বিবেক দেয়া হয়েছে। কোন মানুষ সাময়িকভাবে শয়তানের ধোকায় পড়লে সাথে সাথে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) এর মত তওবা করতে পারে।

উত্তরঃ (৭) যেসব পরিস্থিতিতে শয়তান মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে তা নিম্নরূপ-

(ক) আল্লাহয় অবিশ্বাস। তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার। তাঁর শক্তি ও নেয়ামতের উপর অকৃতজ্ঞ, অবহেলার আচরণ।

(খ) আল্লাহর আনুগত্যহীনতা। তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ করা।

(গ) আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং তাঁর পথ অনুসরণ না করা।

কুরআন বলে কেউ শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করলে সে যেন বলে 'আমি পলায়নপর শয়তানের কবল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি।'

উত্তরঃ (৮) জ্বীন তৈরী প্রসঙ্গে-

জ্বীনেরা মানুষের মতই স্বাধীনভাবে ভাল বা মন্দ যে কোন পথে চলার অধিকার রাখে। যারা বেঈমান অবিশ্বাসী জ্বীন তারা শয়তানের অনুচরে পরিণত হয়। এদের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়। জ্বীন জাতির সৃষ্টি আল্লাহর বিশাল ক্ষমতার বহিঃ প্রকাশ। তিনি এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম মানুষ যাদের দেখতে পারবে না।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ১৫ঃ২৬-২৭, ৬ঃ১৩০, ৪৬ঃ২৯-৩২

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৭ঃ২১, ২ঃ২৬৮, ৮ঃ৪৮, ১৬ঃ৬৩

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ৭ঃ১৬, ৪ঃ১১৭, ৪৩ঃ৬২, ৭ঃ২৭, ৬ঃ১৪২, ২৪ঃ২১, ৩৬ঃ৫৯-৬২

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ৯১ঃ৭-৮, ১৬ঃ৯৮-১০০, ৭২ঃ৬, ২ঃ৩৭, ২০ঃ১২০-১২২

প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ১৯ঃ৮৩, ৫৯ঃ১৬, ৫৮ঃ১৯, ৪৩ঃ৩৬, ৭ঃ২০১, ২৩ঃ৯৮

ডি-৩ যাদু, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং গায়েবী চর্চা বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

প্রশ্ন- (১) মুসলমানরা কি যাদুতে বিশ্বাস করে? ইন্দ্রজাল কি যাদুর অন্তর্ভুক্ত?
প্রশ্ন- (২) ইন্দ্রজাল সম্পর্কে ইসলাম কি বলেছে?
প্রশ্ন- (৩) শুধু জানার জন্য যাদু শেখা যাবে কি?
প্রশ্ন- (৪) কোন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে যাদুকর-এর কাছে যাওয়া কি ইসলাম সম্মত?
প্রশ্ন- (৫) যদি কারও বড় বিপদ হয় তখন সে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে কি করবে?
প্রশ্ন- (৬) ভবিষ্যত জানার জন্য ভাগ্যগণনাকারীর কাছে যাওয়া যায় কি?
প্রশ্ন- (৭) নবী-রাসুলরা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা কি 'একমাত্র আল্লাহই গায়েবের জ্ঞান রাখেন' এ ধারণার পরিপন্থী নয়?
প্রশ্ন- (৮) যেসব জ্যোতিষ গ্রহ নক্ষত্র দেখে ভবিষ্যত বর্ণনা করে তাদের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

উত্তরঃ (১) (২) যাদু ও ইন্দ্রজাল-

মুসলমানরা যাদু বিদ্যার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করে কিন্তু যাদু বিদ্যায় বিশ্বাস করে না। যাদু সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী এর ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যেমন এক ধরনের যাদু যার নাম আরবীতে 'সিহুর' যা শুধুমাত্র আনন্দ খেলাধূলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা নির্দোষ। কিন্তু যে যাদুর কৌশল ও ধাঁধা মানুষকে ঠকাবার এবং ভয় দেখাবার কাজে ব্যবহৃত হয় তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যে যাদুর মাধ্যমে শয়তানী শক্তিকে জাগ্রত করে মানুষের ক্ষতির চেষ্টা করা হয় তাকে বলে ইন্দ্রজাল (Sorcery)। এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কুরআনে এর ক্ষতি থেকে মানুষকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

উত্তরঃ (৩) যাদু শেখা-

কুরআনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও রাসুল (সাঃ) বলেন যে, ৭টি মহাপাপ মানুষের আখেরাত ধ্বংস করে। এর প্রথমটি হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয়টি যাদু বিদ্যায় বিশ্বাস ও চর্চা। যাদু শেখার সাথে এর চর্চার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। চর্চা ছাড়া মানুষ কিছুই শিখে না এজন্যে এটা শেখাও নিষেধ। দেখা যায় যারা যাদুবিদ্যা শিখতে যায় তাদের অনেকে পরিণামে উম্মাদ হয়ে যায়। ইসলাম মানুষকে সব সময় রক্ষা করতে চায়।

উত্তরঃ (৪) (৫) যাদুকর এর সাহায্য গ্রহণ প্রসঙ্গে-

দুটো প্রধান কারণে যাদুকর এর সাহায্য গ্রহণ মুসলমানদের জন্য নিষেধ। প্রথমতঃ যে যাদু চর্চা করে হাদীস অনুসারে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমন ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া অবান্তর এবং গোনাহের কাজও বটে। দ্বিতীয়ত একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাখেন। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কারো পক্ষে অন্য কারো ক্ষতি করা সম্ভব না।
বিপদে পড়লে যাদুকরের সাহায্য না নিয়ে যা করা উচিৎ–
(ক) দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর ক্ষমতায় কারো ভাগ নেই।

(খ) একমাত্র আল্লাহই ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। কাজেই যাদুকর বা অন্য কোন শক্তির উপর বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে হবে।
(গ) আল্লাহর উপর আস্থা রেখে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাঁকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভেবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বিপদ থেকে উদ্ধার চাইতে হবে।
(ঘ) নিজের বুদ্ধি, সাধ্য, শক্তি প্রয়োগ করে সঙ্কট উত্তরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে আল্লাহর উপর আস্থা অটল রেখে বন্ধুদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

উত্তরঃ (৬) গায়েব-এর জ্ঞান প্রসঙ্গে-

কুরআনে অদেখা বিষয় সম্পর্কে 'গায়েব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সে জগতের খবর আমাদের জ্ঞানের বাইরে। তিন ধরনের গায়েব আছে।
(ক) আমাদের নিকট অতীতের বিষয় সম্পর্কে আমরা জানি না। কারণ তখন আমরা ছিলাম না। তবে তখন যারা ছিলেন তাদের লেখা থেকে আমরা সে ইতিহাস অবহিত হতে পারি।
(খ) সুদূর অতীতের বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। মানুষের পৃথিবীতে আবাসের আগে কি ছিল কিভাবে এখানে বসতি হল। এ সম্পর্কে শুধু অনুমান করতে পারি।
(গ) ভবিষ্যতে কি হবে, মৃত্যুর পর কি হবে এসব বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই এসবের খবর রাখেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে এই সব বিষয়ের কিছু খবর আমাদের দিয়েছেন।

উত্তরঃ (৭) (৮) নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী ও জ্যোতিষ শাস্ত্র--

কোন গণক অথবা জ্যোতিষ ভবিষ্যতের খবর দিতে পারে না। গায়েবের এবং ভবিষ্যতের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। নবীগণই আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুসংস্কার প্রভাবিত ও প্রতারণার কৌশল। কুরআনে বলা হয়েছে যে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে চারটি কাজ হয় যথা ঃ
(ক) সৌন্দর্য বৃদ্ধি
(খ) নাবিক ও পর্যটকদের দিক নির্ণয়ে সাহায্য
(গ) আকাশকে আলোকিত করা।
(ঘ) সূর্যের মত উজ্জ্বল (glorious) হওয়া।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৭ঃ১১৩-১১৬, ২০ঃ৬৬, ১১৩, ২ঃ১০২
প্রশ্ন- (২) এবং (৩) আল কুরআন ২ঃ১০২
প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ২৭ঃ৬৫, ৬ঃ৫০, ৭ঃ১৮৮, ৩৪ঃ১৪
প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ৭২ঃ২৬-২৭
প্রশ্ন- (৮) আল কুরআন ১৫ঃ১৬, ৬ঃ৯৭, ২৫ঃ৬১, ১০ঃ১৫

ডি-৪ স্বপ্ন, অশুভ-লক্ষণ, হিংসা, নষ্ট-নজর, বশীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী-

প্রশ্ন- (১) গায়েবের এমন কোন বিশেষ দিক আছে কি যা শুধু আল্লাহ্ জানেন বলে ইসলামে বলা হয়েছে?

প্রশ্ন- (২) উপরের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত ৫টি বিষয় কি বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জানা যায়?

প্রশ্ন- (৩) কারো কারো দেখা স্বপ্ন সত্যি হয়। এটা কি এ ধারণার পরিপন্থী যে মানুষ ভবিষ্যত জানতে পারে?

প্রশ্ন- (৪) অশুভ লক্ষণ, অপয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে কুরআন কিছু বলেছে কি?

প্রশ্ন- (৫) শুভ লক্ষণ, পয়মন্ত ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৬) ইসলাম মতে হিংসা, নষ্ট-নজর ইত্যাদি মানুষের ক্ষতি করতে পারে কি?

উত্তরঃ (১) যে সব বিষয় শুধু আল্লাহ্‌র জানা-

মানুষ বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে। তবু কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, ৫টি বিষয়ে জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আছে। যথা–

(ক) কেয়ামত ও হাশর কবে হবে।

(খ) বৃষ্টিপাত।

(গ) মাতৃগর্ভে কি আছে।

(ঘ) মানুষ আগামী দিন কি রোজগার করবে।

(ঙ) মানুষ কোথায় কিভাবে মারা যাবে।

উত্তরঃ (২) এই পাঁচটি বিষয়ে বিজ্ঞান কি ধারণা দিতে পারে-

অনেকে বলবেন যে বিজ্ঞান আজকাল বৃষ্টিপাত, মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুর পূর্বাভাস দিতে পারে। কিন্তু এতে জ্ঞানের জগতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয় না। প্রথমতঃ আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে পূর্বাভাস দেন তা প্রকৃতির কিছু নিয়ম পর্যবেক্ষণ করে। প্রকৃতির এসব নিয়ম আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন যা পর্যবেক্ষণ করে মানুষ কিছু বিষয়ের পূর্বাভাস পেতে পারে। আল্লাহই প্রকৃতিকে নিয়মের অধীন করেছেন। তিনি যে কোন সময় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোর সামর্থ্য রাখেন, যা বিজ্ঞানীরা রাখেন না। এজন্যে অনেক সময় পূর্বাভাস ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞানীরা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কাজেই মানুষের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানও আল্লাহ্ সৃষ্ট নিয়মের গবেষণার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ মানুষের এসব পূর্বাভাস অকাট্য নয় এবং তা মূলতঃ কিছু মৌলিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। যেমন বিজ্ঞানীরা মাতৃগর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে, তার কোন জন্মগত দোষ হবে কিনা ইত্যাদি পূর্বাভাস দিতে পারেন। কিন্তু সন্তান ভাল হবে না মন্দ হবে, বিশ্বাসী হবে না অবিশ্বাসী হবে, কবে কোথায় সে মারা যাবে ইত্যাদি কিছুই বলতে পারেন না।

নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরীজীবি বলতে পারে যে আগামী সপ্তাহে সে কত রোজগার করবে। কিন্তু এটাই সব নয়। সে কত পাপ-পূণ্য অর্জন করবে তা সে বলতে পারবে না। তার রোজগারে কত বরকত হবে তাও তার ধারণার বাইরে।

ক্যান্সার রোগীকে হয়ত ডাক্তার মৃত্যুর পূর্বাভাস দিতে পারবেন। কিন্তু ঠিক কবে কোথায় কি অবস্থায় মৃত্যু ঘটবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।
এসব কারণে একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, জন্ম-মৃত্যু, রিজিক, কালের আবর্তন-বিবর্তন, জগতের বিনাশ (কেয়ামত) এসব বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করা যায় না। এ সবের আসল জ্ঞান আমরা আল্লাহর ওহী থেকেই লাভ করতে পারি।

উত্তরঃ (৩) স্বপ্ন-

রাসুল (সাঃ)-এর মতে স্বপ্ন তিন প্রকার- যথা ঃ
(ক) ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়।
(খ) খারাপ/কুমন্ত্রণাপূর্ণ স্বপ্ন শয়তান দেখায়।
(গ) সাধারণ স্বপ্ন মানুষের চিন্তা থেকে উদ্ভূত।

খারাপ স্বপ্ন দেখলে শয়তানের কবল থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। খারাপ স্বপ্ন দেখার পর পাশ ফিরে শুতে বলা হয়েছে। অথবা ঘুম থেকে উঠে অজু করে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে। খারাপ স্বপ্নের বিষয় অন্যকে না বলাই উত্তম।
ভাল স্বপ্নের খবর আপনজনদের বলা যায়। নবীদের স্বপ্ন ওহীরই এক রূপ। তাঁরা তা অনুসারীদের বলতেন।

উত্তরঃ (৪) (৫) মন্দভাগ্য, অপয়া, পয়মন্ত ইত্যাদি প্রসঙ্গে-

এটা একটি কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস যে কারো সাথে মন্দভাগ্য বা অশুভ কিছু আসে। একইভাবে কারো আগমনে ভাগ্য ফিরে এমন ধারণাও কুসংস্কার। ইসলামে এসবের কোন অনুমতি নেই। একমাত্র আল্লাহই ভাল-মন্দ বিতরণের সামর্থ্য রাখেন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভাল বা মন্দ নির্ধারণের সামর্থ্যবান মনে করা আল্লাহর সাথে শরীক করার নামান্তর।
রাসুলের হাদীসে দেখা যায় যে, গলার মালা, পাথর ইত্যাদিতে ভাগ্য ফিরে এমন ধারণা করা শিরক। ইসলাম আরও বলে যে কারো জীবনকে প্রভাবিত করার শক্তি Talisman-এর নেই। একমাত্র আল্লাহই মানুষকে জীবন-মৃত্যু দান করেন।

উত্তরঃ (৬) নষ্ট নজর-

মানুষ সব সময় হিংসুকের নষ্ট নজর নিয়ে শঙ্কিত থাকেন। ইসলাম এ ব্যাপারে বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেয় না। শুধু হিংসুকের হিংসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলে। এ ব্যাপারে শেষ দুটো সুরা তেলাওয়াত করলে উপকৃত হওয়া যায়।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৩১ঃ৩৪
প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৩৭ঃ১০০, ১১৩
প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৩৬ঃ১৮, ২৭ঃ৪৭, ৭ঃ১৩১
প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ১১৩ঃ৫

ডি-৫ আত্মা

প্রশ্ন- (১) মুসলমানরা কি মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে? এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি?
প্রশ্ন- (২) আত্মার সংজ্ঞা কি?
প্রশ্ন- (৩) আত্মা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের উৎস কি?
প্রশ্ন- (৪) শরীরের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় আত্মা থাকে কি?
প্রশ্ন- (৫) আত্মা আল্লাহ থেকেই এসেছে। আর আল্লাহ চিরঞ্জীব। তাহলে আত্মাও কি চিরঞ্জীব? আমাদের দৈহিক মৃত্যুর সাথে কি আত্মারও মৃত্যু ঘটে?
প্রশ্ন- (৬) মৃত্যু সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কি?
প্রশ্ন- (৭) মৃত্যুর সময় মানুষ কি দেখে এ সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয়েছে কি?

উত্তরঃ (১) মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস-
আখেরাতে বিশ্বাস ঈমানের একটি মৌলিক অংশ। এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে আত্মার অস্তিত্বের স্বীকৃতি।

উত্তরঃ (২) আত্মা এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস-
বস্তুগতভাবে মানুষের শরীর পানি, খনিজ পদার্থ, শর্করা, চর্বি ও আমিষে গঠিত। সকল পশু-পাখি প্রাণীর শরীর এভাবে গঠিত। কিন্তু আত্মার অস্তিত্বই মানুষকে এদের থেকে পৃথক করেছে। তাকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে। আত্মার উপস্থিতির কারণে তার মাঝে যুক্তি, বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটেছে। সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে এবং তার স্রষ্টাকে চিনতে সমর্থ হয়। আত্মা মানুষকে পরকালের অবিনশ্বর জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করে। আত্মা কোন বস্তুগত বিষয় নয়। তাই এটা বস্তুজগতের নিয়মের অধীন নয়। ফলে শুধু বস্তুজগতে সীমাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা দিয়ে এর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এ সংক্রান্ত একমাত্র জ্ঞানের উৎস আধ্যাত্মিক ওহী। কুরআনে আত্মা সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য আছে।

উত্তরঃ (৪) (৫) আত্মার অবস্থান এবং এর চিরস্থায়ী জীবন-
মানুষের শরীরের ঠিক কোথায় আত্মা অবস্থান করে এ বিষয়ে কুরআনে কোন উদ্ধৃতি নেই। রাসুল (সাঃ)-এর একটি হাদীস মতে এক নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ গর্ভস্থ ভ্রূণে আত্মা ফুঁকে দেন। তারপর থেকে আমৃত্যু আত্মা শরীরের সাথে থাকে। সেদিন থেকে ভ্রূণ জৈবিক সত্তার সাথে আধ্যাত্মিক সত্তায় পরিণত হয়।
আত্মা আল্লাহ থেকে উদ্ভূত এবং অবিনশ্বর কিন্তু তাই বলে এর স্বাধীন শক্তি নেই। ভ্রূণ অবস্থায় শরীরে প্রবেশের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আত্মা এর ভেতরে থাকে। মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়। আবার পুনরুত্থানের দিন আত্মা শরীরে প্রবেশ করবে। তখন সেই সশরীরি সত্তা পৃথিবীর জীবনে ভাল বা মন্দ কাজের পুরস্কার বা শাস্তি লাভ করবে।

উত্তরঃ (৬) (৭) মৃত্যু-

মুসলমানরা মৃত্যুকে কোন আলোচনা নিষিদ্ধ বিষয় মনে করেনা। বরং মুসলমানরা মৃত্যুকে জন্মের মতই একটি বাস্তবতা মনে করে। কুরআন বলে যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। তা থেকে পালাবার কোন পথ নেই। মৃত্যু জীবনের সাথে সব সময় জড়িত। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। জন্মের মতই মৃত্যু সত্য। আল্লাহ্ যখন যার, যেখানে যেভাবে মৃত্যু নির্ধারিত রেখেছেন তার সেখানে সে অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য। মুসলমানরা এটা বলে না যে ডাক্তার তার আয়ু বাড়িয়েছে। কারণ আল্লাহই মানুষের জন্ম-মৃত্যুর দিনক্ষণ নির্ধারণ করেন।
যেহেতু মুসলমানরা আখেরাতে বিশ্বাস করে সেহেতু তাদের কাছে মৃত্যু হচ্ছে আত্মার অবস্থানের পরিবর্তন মাত্র। বস্তুতঃ আত্মা অবিনশ্বর। তাই মুসলমানরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। বরং তাকে অনিবার্য জেনে জীবন থাকতেই আখেরাতের প্রস্তুতি নেয়। কুরআন বলে মৃত্যুর সময় সব মানুষ যা মনে করে তা হচ্ছে আর কিছুক্ষণ যদি জীবন পেতাম তবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে নিবেদিত করতাম।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৪২ঃ৫২, ৫৮ঃ২২, ৪ঃ১৭১, ৩২ঃ৯
প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ১৭ঃ৮৫
প্রশ্ন- (৫) হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন যে, গর্ভাবস্থায় চতুর্থ মাসের শেষ দিনে ভ্রূণে আল্লাহ্ রুহ ফুঁকে দেন।
প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ২১ঃ৩৫, ২৯ঃ৫৭, ৪ঃ৭৮, ১৬ঃ৬১, ৬৭ঃ১-২
প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ৬৩ঃ১০

ডি-৬ মৃত্যু

প্রশ্ন- (১) মানুষ মৃত্যুর সময় কি অভিজ্ঞতা লাভ করে?
প্রশ্ন- (২) মৃত্যুর সময় মানুষ কি তার ভবিষ্যত পরিণতি (বেহেশত/দোজখ) সম্পর্কে জানতে পারে?
প্রশ্ন- (৩) মৃত্যুর সময় মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আর কোন উদ্ধৃতি আছে কি?
প্রশ্ন- (৪) যারা বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনায় প্রায় মৃত্যুর সমতুল্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলে দাবী করেন তাদের বিষয়ে কি বলবেন?

উত্তরঃ (১) ও (২) মৃত্যুর অভিজ্ঞতা-

কুরআন ও হাদীসে মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে–

(ক) সব মানুষ মৃত্যু শয্যায় চিন্তা করবে যে সে আর একটু সময়ের জন্য জীবন পেলে হাশরের দিনে পুরস্কার পেতে আরও ভাল কাজ করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতো।

(খ) মৃত্যুর সময় সে তার ভাগ্যকে দেখতে পায়। তার সাথে আজরাইলের আচরণের মাধ্যমে সে বেহেশতে না দোজখে যাচ্ছে তা টের পায়। সৎকর্মশীলদের আজরাইল সালাম দিয়ে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়। তাদের রুহ অতি সহজে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কারণ যত তাড়াতাড়ি দেহ ত্যাগ তত তাড়াতাড়ি মুক্তি। অসৎ লোকদের জন্য আজরাইলের ব্যবহার থাকে কঠোর। তাদের আত্মা শরীর থেকে বের হতে চায়না।কারণ দেহত্যাগ মানেই তো দোজখের আগুন।

উত্তরঃ (৩) ও (৪) মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ও প্রসঙ্গ কথা-

মৃত্যু এমন যে এর অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ ফিরে এসে তার বর্ণনা দিতে পারে না। একবার মৃত্যুবরণ করলে আর ইহজীবনে ফিরে আসা যায়না। এটা পৃথিবীর এবং আখেরাতের মাঝে এক দেয়ালের মত। কুরআন মৃত্যু সম্পর্কে 'সকরা' শব্দ ব্যবহার করেছে যার অর্থ 'Stupor'। মৃত্যুর কাছাকাছি বলে কিছু নেই যার বিপদে বা দূর্ঘটনায় পড়ে মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা পেয়েছেন বলেন তার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য–

(ক) গল্প, সাহিত্য এবং বিভিন্ন আত্মজীবনীতে যাদের মৃত্যুতুল্য অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলোতেই মৃত্যুকে পরম শান্তির এবং জগতের যাবতীয় ক্লান্তি, অবসাদ, জটিলতা থেকে মুক্তির বিষয় বলে চিত্রায়িত করা হয়েছে। অথচ সবার জন্য মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এক রকম হতে পারে না। এটা ইসলামের শাশ্বত ন্যায় বিচার বিরোধী। যারা সৎকর্মশীল এবং যারা পাপী এই উভয় সম্প্রদায়ের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সঙ্গতকারণেই এক রকম হবে না।

(খ) দ্বিতীয়তঃ মুসলমানরা এটাও বিশ্বাস করে যে মৃত্যু হচ্ছে অপরিবর্তনীয়। কাজেই এর অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে কেউ এর বর্ণনা দিতে অক্ষম। মানবীয় প্রযুক্তি খাটিয়ে গবেষণা করে এ সংক্রান্ত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। এটা আসলে গায়েবী বিষয়। এ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহর ওহী ভিন্ন লাভ করার উপায় নেই।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ২৩ঃ৯৯-১০০, ৬ঃ৬১, ৩২ঃ১১, ৫০ঃ১৯
প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ১৬ঃ৩২, ৪১ঃ৩০-৩২, ৮ঃ৫০, ৬ঃ৯৩
প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৭ঃ৪০

ডি-৭ মৃত্যু (চলমান)

প্রশ্ন- (১) আপাতঃ মৃত্যু বা মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতাগুলোকে কি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?
প্রশ্ন- (২) আত্মহত্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?
প্রশ্ন- (৩) যন্ত্রণাদায়ক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় শান্তিপূর্ণ মৃত্যু (Euthanasia) ত্বরান্বিত করার অনুমতি ইসলামে আছে কি?
প্রশ্ন- (৪) মারাত্মক অসুস্থ ও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত মানুষের সেবার ব্যাপারে ইসলামে কোন নির্দেশনা আছে কি?
প্রশ্ন- (৫) কবর দেবার পর আত্মার কি হয়?
প্রশ্ন- (৬) মৃত ব্যক্তির আত্মা কি পৃথিবীতে কি ঘটছে তা জানতে পারে?

উত্তরঃ (১) মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতাসমূহ-

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো মস্তিষ্কের কিছু মেমোরি কোষে জমা থাকে। কোনভাবে উদ্দীপ্ত করলে এই স্মৃতিগুলো রেকর্ড করা টেপ রিউইন্ড করার মত দ্রুততার সাথে মনে ভেসে উঠে। এভাবে অনেক সময় মানুষ ভয়াবহ বিপদে জীবন নিয়ে শঙ্কায় পড়লে তার মনে জীবনের অনেক ছবি দ্রুত আবর্তিত হয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে মৃত্যুর অভিজ্ঞতার সাথে এর কোন তুলনা করা যায় না। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কেমন তা কেবল মৃতরাই বলতে পারেন। আমাদের এ বিষয়ে একমাত্র জ্ঞানের উৎস ওহী তথ্য কুরআন।

উত্তরঃ (২) আত্মহত্যা-

ইসলামের আত্মহত্যা মহাপাপ। এর জন্যে আখেরাতে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। রাসুলের একটি হাদীস অনুসারে হাশরের দিনে আত্মহত্যাকারী নিজেকে এক জীবন মৃত্যু চক্রে দেখতে পাবে। সে বার বার আত্মহত্যা করবে আর জীবন লাভ করবে। দুটো কারণে ইসলাম আত্মহত্যার ব্যাপারে এত কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে–

(ক) ইসলাম মতে কোন মানুষ সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা রাখেন না। সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ কাজেই আমাদের জীবনও আমাদের একচ্ছত্র সম্পদ নয়। জীবন আল্লাহর দেয়া সবচেয়ে বড় সম্পদ ও আমানত। এটা আমরা ইচ্ছেমত ধ্বংস করতে পারি না।

(খ) যেহেতু জীবন হচ্ছে আল্লাহর আমানত সেহেতু মানবতার কল্যাণে একে নিয়োজিত করতে হবে। তা না করে এর ধ্বংস সাধন হবে আল্লাহর আমানতের খেয়ানত বা তাঁর সাথে প্রতারণা।

রাসুল (সাঃ)-এর মতে চরম হতাশা, শোক-যন্ত্রণার সময় একজন মানুষ সর্বোচ্চ যা করার অনুমতি রাখে তা হচ্ছে এই দোয়া "হে আল্লাহ আমাকে জীবন দান কর যদি তা আমার জন্য উত্তম হয়, অথবা আমাকে মৃত্যু দান কর যদি তুমি আমার জন্য তা উত্তম মনে কর।"। বস্তুতঃ একজন মুসলমান কখনও আল্লাহর দয়া ও রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হতে পারে না। কখনও নিজের হাতে আল্লাহর দেয়া জীবন তুলে নিতে পারে না।

উত্তরঃ (৩) কৃপাহত্যা (Euthanasia) বা কল্যাণদায়ক মৃত্যু-

ইসলামে কোন কল্যাণদায়ক মৃত্যুর সুযোগ নেই। কাজেই যে ব্যক্তি রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে নিজেকে মেরে ফেলতে অনুরোধ করে সে প্রকারান্তরে আত্মহত্যাকেই বেছে নেয়। আত্মহত্যার দায় অন্যকে হত্যার অনুরোধ করে এড়ান যায় না। ইসলাম কারো মৃত্যুর জন্য ঔষধ প্রয়োগকে নিষেধ করে। তবে ক্লিনিক্যালি মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক কাজ করছে না কৃত্রিমভাবে তার শ্বাসযন্ত্র, হৃদযন্ত্র, কিডনী সচল রাখা হয়েছে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান হচ্ছে যে দীর্ঘকাল এমন কৃত্রিম 'Lifesupport' অব্যাহত রাখতে কেউ বাধ্য নয়।

উত্তরঃ (৪) মৃত প্রায় ব্যক্তি প্রসঙ্গে-

মৃত প্রায় মারাত্মক অসুস্থ ব্যক্তিকে দয়া, সহানুভূতি ও যত্নের সাথে সেবা করতে ইসলাম আদেশ করে। কোন ধ্বংসাত্মক কাজের অনুমতি ইসলামে নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে অসুস্থতা হচ্ছে পরিশুদ্ধি বা গোনাহ্ মাফের একটি মাধ্যম। রোগ যন্ত্রণা ভোগ করার মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তি তার দুনিয়ার বিভিন্ন ভুল ত্রুটির দায় দুনিয়াতেই শোধ করে যায়। এর বিনিময়ে তার আখেরাতের সাজা মওকুফ হবে। এজন্যে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর দৈহিক সেবার সাথে তার আধ্যাত্মিক সেবাও করা উচিত। তাকে তওবা করতে এবং আল্লাহর নৈকট্যের দোয়া করতে বলা উচিৎ। মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য ইসলাম যেসব কাজ করতে বলে তা হচ্ছে–

(ক) সে যেন কলেমা শাহাদাৎ পড়ে অথবা তাকে যেন কলেমা পড়ে শুনানো হয়। এভাবে সে এক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর বিশ্বাস ঘোষণা করে মৃত্যুকে বরণ করবে।

(খ) সূরা ইয়াসীন পড়া। কারণ এ সুরায় মানব সৃষ্টি, মৃত্যু এবং পুনর্জাগরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(গ) মৃত্যুর পর তার চোখ বন্ধ করে দিতে হবে। যথাসম্ভব দ্রুত তাকে দাফন করতে হবে। আপনজনের শোক এবং দুঃখ তো অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য। তবু তাকে যথাসম্ভব সংযত করতে হবে কারণ উচ্চস্বরে কান্নাকাটিতে আত্মা কষ্ট পায়।

উত্তরঃ (৫) (৬) মৃত্যুর পর আত্মার অভিজ্ঞতা-

কুরআন ও হাদীস অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মার অভিজ্ঞতা–

(ক) তাকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হয় কে তার স্রষ্টা, কে তার নবী ইত্যাদি। ঈমানদারদের জন্য এসব প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ । কিন্তু অবিশ্বাসী বেঈমানদের জন্য এসব প্রশ্ন দুঃসাধ্য।

(খ) প্রশ্নোত্তরের পর সে বেহেশতে বা দোজখে তার অবস্থান দেখতে পায়।

(গ) হাশরের দিনে যে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে তা তখন থেকেই শুরু হয়।

এছাড়া রাসুলের হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পরও আত্মারা পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকে। তারা কবরস্থান পরিদর্শনে আসা মানুষের পদধ্বনি শোনে। তারা কবর জিয়ারত রত মানুষের সালামের জবাব দেয়। খোদ রাসুল (সাঃ) তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সালাম ও দোয়ার জবাব দেন।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৪ঃ২৯, ১২ঃ১৮

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ১৪ঃ২৭, ৪০ঃ৪৬

ডি-৮ মৃত্যুর পর

প্রশ্ন- (১) মৃত আত্মারা কি জীবিত মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে? প্ল্যানচেট-এর ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

প্রশ্ন- (২) মৃত আত্মা কি অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে পারে?

প্রশ্ন- (৩) এমন কোন নির্দিষ্ট স্থান আছে কি যেখানে আত্মা থাকে?

প্রশ্ন- (৪) পুনর্জন্ম বা পরজনমবাদে মুসলমানরা বিশ্বাস করে কি?

প্রশ্ন- (৫) আত্মার তিন অবস্থা বলতে কি বুঝায়?

প্রশ্ন- (৬) হাশরের দিন বলতে কি বুঝায়? মুসলমানদের ঈমানে এর স্থান বলতে কি বুঝায়?

প্রশ্ন- (৭) পুনরুত্থান বলতে কি শুধু আত্মার পুনরুত্থানকেই বুঝায় নাকি দেহ এবং আত্মা দুটোরই পুনরুত্থান বুঝায়?

উত্তরঃ (১) (২) (৩) আত্মার সাথে যোগাযোগ-

কুরআন থেকে জানা যায় যে মৃত আত্মাদের নিজেদের মধ্যে এবং জীবিত ব্যক্তিদের সাথে কিছু কিছু যোগাযোগ থাকে। অবশ্য একজনকে মাধ্যম বানিয়ে তার বয়ানে মৃত ব্যক্তির আত্মার কথা শোনার যে রীতি (প্ল্যানচেট) প্রচলিত তা ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়। মৃতের সাথে যোগাযোগের ব্যাখ্যা হিসেবে ঘুমের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। ঘুম একটি সাময়িক মৃত্যুর মত। ঘুমের সময় কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ মানুষের আত্মাকে নিয়ে নেন। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে যখন কেউ মৃত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনকে দেখে তখন সম্ভবতঃ যা হয় তা হচ্ছে মৃত ব্যক্তি ও ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মার সাক্ষাত। এভাবে মৃত আত্মার পক্ষে জীবিত লোকদের সাথে এবং মৃতুদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব।

এছাড়াও কুরআন বলে যে মৃত আত্মারা পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত। ঈমানদারদের মৃত আত্মা নবী, শহীদ এবং নেকবান ব্যক্তিদের আত্মার সংস্পর্শে থাকে। যদিও এ ধরনের যোগাযোগ সম্পর্কে আমাদের বাস্তববাদী মনে ধারণা করা কষ্টকর। তবুও এটা বোঝা উচিত যে আত্মা হচ্ছে অপার্থিব বিষয়। তার পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব যা আমাদের পার্থিব অনুভূতির সীমার বাইরে।

কুরআন এবং হাদীসে আরও বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর থেকেই আত্মা হাশরের পরে তার প্রাপ্য পুরস্কার বা শাস্তি অনুভব করতে থাকে।

উত্তরঃ (৪) পুনর্জন্ম-

মুসলমানরা হিন্দুদের মত পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে না। পুনর্জন্ম মানে মৃত্যুর পর পৃথিবীতেই অন্যরূপে আসা। যা বেশ যৌক্তিক কারণেই অবাস্তব। মুসলমানরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে তা হচ্ছে কেয়ামতের পর হাশরের ময়দানে সকল মানুষ পুনর্জ্জীবিত হয়ে বিচারের জন্য দাঁড়াবে।

উত্তরঃ (৫) আত্মার তিন অবস্থা-

ইসলাম মতে আত্মার তিন রূপ বা অবস্থা আছে; যথা–

(ক) নফস আল-আম্মারা ঃ যে প্রবৃত্তি মানুষকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করে।

(খ) নফস আল-আওয়াম্মা ঃ যে প্রবৃত্তি আত্মসমালোচনা করায় ও খারাপ কাজ থেকে সতর্ক করে।

(গ) নফস আল-মুতমায়িন্না ঃ সফল প্রবৃত্তি। যা আল্লাহর ধ্যানে প্রশান্ত থাকে।

৮৯নং সূরায় ২৭ থেকে ৩০ নং আয়াতে তৃতীয় নফসের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে।

উত্তরঃ (৬) হাশরের দিন-

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে সমস্ত জীবনের একদিন সমাপ্তি ঘটবে। কারণ এ জীবন এ পৃথিবী কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ নির্ধারিত একদিন প্রচণ্ড আলোড়নে সমগ্র পৃথিবী ও জীবজগত ধ্বংস হবে। তারপর সৃষ্টির আদি থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে তাদের কৃতকর্মের বিচারের জন্য আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। যারা সৎকর্মশীল, ঈমানদার তারা আল্লাহর রায় নিয়ে বেহেশতে যাবে। আর বেঈমান অসৎ ব্যক্তিরা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এই হাশরের দিনে বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের অংশ। যে হাশরের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করবে সে মুসলিম নয়। এটাকে ঈমানের প্রাণও বলা যায়। কারণ এই জবাবদিহিতার অনুভূতি থেকেই মানুষের মাঝে দায়িত্ব সচেতনতা আসে। জীবন লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন নয়। এক বিরাট দায়িত্ব নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। একদিন এ দায়িত্ব পালন করা প্রসঙ্গে মালিকের কাছে হিসেব দিতে হবে।

উত্তরঃ (৭) আত্মা এবং শরীরের পুনরুত্থান প্রসঙ্গে-

কুরআন মতে হাশরের দিনে আত্মা এবং শরীর উভয়েরই পুনরুত্থান হবে। অবশ্য সেই নতুন জীবনে এই শরীরই তার অবিকল গঠন নিয়ে পুনর্জীবন লাভ করবে নাকি অন্য কোন আকারে গঠিত হবে তা স্পষ্ট করে আমরা জানিনা। কুরআন থেকে এটাও স্পষ্ট যে আত্মা তার কবর জীবন থেকেই বেহেশত বা দোজখের স্বাদ অনুভব করবে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৩৯ঃ৪২

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৩ঃ১৭০, ৪ঃ৬৯

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ১২ঃ৫৩, ৭৫ঃ১-২, ৮৯ঃ২৭-৩০

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ২৩ঃ১১৫-১১৬, ৩০ঃ৫৬, ২২ঃ১, ৮৭ঃ১৭, ১ঃ৪, ৪০ঃ২৭, ৬৪ঃ৯, ৫০ঃ৪২, ৭৯ঃ৩৪-৩৫, ৮০ঃ৩৩-৩৪, ৫০ঃ৩৪

প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ৫৬ঃ৬০-৬১

ডি-৯ পুনরুত্থান

প্রশ্ন- (১) যারা বলে, 'মৃত্যুর পর কবরে ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীর কিভাবে আবার জেগে উঠবে?' তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলবেন?

প্রশ্ন- (২) এটা বলা কি ঠিক যে শুধু বিশ্বাসীদেরই পুনরুত্থান হবে অবিশ্বাসীদের নয়?

প্রশ্ন- (৩) কোন দিন হাশর হবে তার ব্যাপারে কুরআনে কোন ইঙ্গিত আছে কি?

প্রশ্ন- (৪) হাশরের দিন সমাগত হবার সময়কার কোন লক্ষণ উল্লিখিত আছে কি?

প্রশ্ন- (৫) শেষ দিনটির আগে মানুষের আর্থিক অবস্থা কেমন হবে সে বিষয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি?

প্রশ্ন- (৬) শেষ দিনটির আগে মানুষের স্বাস্থ্যগত অবস্থা কেমন হবে তার কোন উল্লেখ আছে কি?

উত্তরঃ (১) পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের জবাব-

যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা পুনরুত্থান নিয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তি ও দালিলিক প্রমাণ দিতে তারা অক্ষম। অথচ বাস্তবতাও স্বাক্ষী দেয় যে (Accountability'র জন্য) পৃথিবীর জীবনের পর আর একটি জীবন প্রয়োজন। কুরআনে সে জীবন এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে অনেক যুক্তি দেয়া হয়েছে। (সূত্র দেখুন) এসব যুক্তির সারমর্ম নিম্নরূপ–

(ক) মানুষকে আল্লাহ শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি একবার সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি আবারও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।

(খ) আল্লাহর পক্ষে যে কোন কিছুকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া অত্যন্ত সহজ। মৃতকে পুনর্জীবিত করাও তাঁর পক্ষে একইভাবে সোজা।

(গ) আল্লাহ প্রতি মৌসুমে চাষবাসহীন উষর ভূমিকে প্রাণবন্ত সবুজ ফসলে ভরে দিয়ে তাঁর মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দেখাচ্ছেন।

উত্তরঃ (২) শুধু কি বিশ্বাসীদেরই পুনরুত্থান হবে-

সমগ্র মানবজাতিরই পুনরুত্থান হবে- এটাই ইসলামের শিক্ষা। এটা আল্লাহর ন্যায়নীতির পরিপন্থী হবে যে শুধু বিশ্বাসীরাই জবাবদিহির জন্য পুনর্জ্জীবিত হবে আর অবিশ্বাসী পাপীরা নির্বিঘ্নে থাকবে। পুনরুত্থানের ব্যবস্থা আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। যার মাধ্যমে তিনি ভাল-মন্দ সবাইকে তাদের কাজের উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন।

উত্তরঃ (৩) হাশর কোনদিন হবে-

হাশর কবে হবে এ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই জানেন। রাসুল বলেছেন, দিনটি আসবে হঠাৎ করে এবং আকস্মিকভাবে সব মানবীয় তৎপরতা সেদিন বন্ধ হয়ে যাবে। বস্তুতঃ ঠিক কোনদিন হাশর হবে এটা জানা মুসলমানদের জন্য জরুরী নয়। বরং জরুরী দিনটির অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং এই দিনটিতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির জন্য নিজেকে তৈরী করা। অবশ্য রাসুল (সাঃ) পৃথিবীর শেষ দিনটির আগমন সম্পর্কে কিছু পূর্বাভাস দিয়েছেন। এর মধ্যে কিছু পূর্বাভাসে সাধারণভাবে ঐ সময়ের আর্থ-সামাজিক নৈতিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে আর কিছু পূর্বাভাসে

বিশেষভাবে কেয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে। রাসুল (সাঃ) বর্ণিত কেয়ামতের আলামতগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- Major Signs এবং Minor Signs।

উত্তরঃ (৪) (৫) সাধারণ আলামত ঃ অর্থনৈতিক অবস্থা-

রাসুলের কিছু ভবিষ্যদ্বাণীতে পৃথিবী ধ্বংসের আগে এখানে যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি, আর্থিক প্রাচুর্য ও প্রাণঘাতী রোগের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, তখন যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসাধারণ উন্নতি হবে এবং প্রাণহীন জিনিসও কথা বলতে সক্ষম হবে। সুদী কারবার ব্যাপক প্রসার লাভ করবে। আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরী হবে। বিত্তবৈভব জৌলুসে মানুষ গা ভাসাবে আবার তারই পাশে ভুখা নাঙ্গা মানুষের অবস্থান থাকবে।

উত্তরঃ (৬) কেয়ামেতর আগে মানুষের স্বাস্থ্যগত অবস্থা-

রাসুল (সাঃ) বলেন কেয়ামতের আগে মানুষের মাঝে মদ ও অন্যান্য নেশার উপকরণের ব্যবহার এত বাড়বে যে এটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হবে। ঘাতক ব্যাধির উদ্ভব হবে এবং আকস্মিক মৃত্যুর (সম্ভবতঃ হার্ট এ্যাটাক / স্ট্রোক) সংখ্যা বাড়বে। এসব কিছুই কেয়ামতের পূর্বলক্ষণ।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৪৫ঃ২৪-২৬, ৩৬ঃ৭৭-৭৯,৫০ঃ১৫, ৩০ঃ২৭-২৮, ৪১ঃ৩৯, ২২ঃ৫
প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৩৬ঃ১২, ৩৯ঃ৭০
প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৩১ঃ৩৪, ৪১ঃ৪৭, ৭ঃ১৮৭, ৭৯ঃ৪২
প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ১০ঃ২৪

ডি-১০ কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ

প্রশ্ন- (১) কেয়ামতের আগে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের নৈতিক অবস্থা কেমন হবে এ বিষয়ে রাসুল (সাঃ) কোন পূর্বাভাস দিয়েছেন কি?
প্রশ্ন- (২) কেয়ামতের আর কোন সাধারণ আলামত আছে কি?
প্রশ্ন- (৩) কেয়ামতের দিনের প্রধান লক্ষণগুলো কি কি?
প্রশ্ন- (৪) কেয়ামতের দিনে কি ঘটবে?

উত্তরঃ (১) কেয়ামতের আগে মানুষের নৈতিক অবস্থা-

কেয়ামতের আগে মানুষের ও সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ–

(ক) নারী ,পুরুষ উভয়ের মাঝে অশালীন পোষাক পরার রীতি চালু হবে।
(খ) নারীরা পুরুষের পোষাক পড়বে এবং পুরুষের মত আচরণ করবে। একইভাবে পুরুষও নারীর পোষাক পড়বে।
(গ) নারী এবং পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমকামিতার বিস্তার ঘটবে।
(ঘ) ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হবে।
(ঙ) বৃদ্ধ এবং আত্মীয়দের 'বোঝা' মনে করা হবে। তাদের যত্ন নেয়া হবে না।
(চ) মানুষ সন্তান প্রতিপালনে নিরুৎসাহিত হবে। অথচ কুকুর সহ অন্যান্য পশু অত্যন্ত যত্নের সাথে পালন করবে।
(ছ) শঠতা ব্যাপক বিস্তার লাভ করবে।
(জ) খুন ও হত্যাকাণ্ড ব্যাপক বিস্তার লাভ করবে। এসব এত বাড়বে যে হত্যাকারী নিজেও জানবে না যে সে কেন খুন করল।
(ঝ) মানুষের মাঝ থেকে দানশীলতা দূর হবে।
(ঞ) প্রচুর শাসক আসবে কিন্তু তাদের কিয়দংশই সৎ হবে।
(ট) ন্যায়নীতি নয় বরং ক্ষমতা ও শক্তি হবে ব্যক্তি ও জাতির সম্মান পাবার উৎস।

উত্তরঃ (২) আরও কিছু সাধারণ আলামত-

এছাড়াও রাসুল (সাঃ) আরও কিছু আলামতের কথা বলেছেন তা হচ্ছে–

(ক) প্রচুর ভণ্ড শিক্ষক ও নবীর আবির্ভাব হবে।
(খ) বিশ্বাসীরা পার্থিব স্বার্থে তাদের বিশ্বাস বিক্রী করবে।
(গ) নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহওয়ালা লোকদের ঘৃণার চোখে দেখা হবে। খারাপ লোকেরাই হবে সমাজে গ্রহণযোগ্য।
(ঘ) একই পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে।
(ঙ) অন্যায়কে মোকাবেলার জন্য মানুষ কোন পদক্ষেপ নেবে না ফলে সমাজে অন্যায়ের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে।

(চ) জ্ঞানের সম্প্রসারণের সাথে আল্লাহকে ভোলার প্রবণতা বাড়বে। ঈমান, বিশ্বাস ও মানুষের পারস্পরিক অধিকার সংক্রান্ত অনুভূতি হ্রাস পাবে।

(ছ) অধিকাংশ মুসলমান খারাপ কাজে লিপ্ত হলেও ক্ষুদ্র একদল মুসলামন আল্লাহর পথে থাকবে।

উত্তরঃ (৩) কেয়ামতের দিনের প্রধান লক্ষণ-

কেয়ামতের দিনের প্রধান লক্ষণগুলো সম্পর্কে হাদীসে এবং কুরআনে বলা হয়েছে। কেয়ামতের দিনের ঘটনাগুলো নিম্নরূপ–

(ক) পূর্ব, পশ্চিম এবং আরবের উপরে তিনটি প্রধান সূর্যগ্রহণ হবে।

(খ) প্রচণ্ড ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যাবে। এই ধোঁয়া সম্ভবতঃ কুয়াশা, ধূলা বা এই জাতীয় কিছু হবে।

(গ) পৃথিবীর তলদেশ থেকে এডেন বরাবর আগুন উঠে আসবে।

(ঘ) পূর্ব দিকের পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে। (সৌর জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে)।

(ঙ) এক পশু এসে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলবে।

(চ) বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। এ সময় ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হয়ে সব কিছু ধ্বংস করতে থাকবে।

(ছ) পৃথিবী ধ্বংসের আগে ইমাম মাহদী এসে এখানে শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি হবেন একজন মুসলমান। তাঁর নাম হবে আহমাদ বা মুহাম্মদ।

(জ) ইমাম মাহদীর জীবদ্দশায় দজ্জাল নামে এক শয়তানী শক্তির উদ্ভব ঘটবে। দজ্জাল সম্ভবতঃ এক চোখ বিশিষ্ট হবে এবং মহাপরাক্রমশালী হবে। অসংখ্য মানুষ দজ্জালের অনুসারী হবে। দজ্জাল তাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

(ঝ) এ সময়ে ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন এবং ইমাম মাহদীকে সাথে নিয়ে দজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধে দজ্জাল পরাজিত ও নিহত হবে। রাসুলের একটি হাদীস মতে দজ্জাল জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে এবং মুসলমানরা পূর্ব তীরে অবস্থান নেবে। দজ্জালের পতনের পর অনেক বছর পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে।

(ঞ) এরপর ইমাম মাহদী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। পৃথিবীতে শান্তি বিরাজিত থাকবে। এ সময় ঈসা (আঃ) পৃথিবী থেকে চলে যাবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জন্য জানাযা পড়বে।

(ট) এক শীতল বাতাস প্রবাহিত হবে যা কিছু পরিমাণ ঈমানও যাদের আছে তাদের প্রাণহরণ করবে। কেয়ামত শুরু হবে।

উত্তরঃ (৪) কেয়ামতের দিন যা ঘটবে-

কুরআনে কেয়ামতের দিনের ঘটনাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূত্রে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে জগতের শৃঙ্খলা ভয়াবহভাবে ভেঙ্গে পড়বে। পৃথিবীর তখনকার অধিবাসী সবাই মারা পড়বে। তারপর প্রলয় শেষে পৃথিবীর আদি থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সব মানুষ উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৪৪ঃ১০, ২৭ঃ৮২, ২১ঃ৯৬-৯৭, ৪৩ঃ৬১, ৪ঃ১৫৯

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৭৫ঃ৬-১৩

ডি-১১ জবাবদিহিতা বেহেশত ও দোজখ

প্রশ্ন- (১) হাশরের বিচার অনুষ্ঠান কিসের মাধ্যমে শুরু হবে?
প্রশ্ন- (২) বিচারের ময়দানে কি কি ঘটবে- এ বিষয়ে কুরআন কিছু বলেছে কি?
প্রশ্ন- (৩) মানুষের মুক্তি ও বেহেশত লাভ কি শুধু মাত্র তার আমলের মাধ্যমে অর্জিত হবে? না-কি আল্লাহর ক্ষমার মাধ্যমে?
প্রশ্ন- (৪) হাশরের বিচারের পর কি ঘটনা ঘটবে?
প্রশ্ন- (৫) দোজখ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি ?
প্রশ্ন- (৬) বেহেশত সম্পর্কে কুরআনে কি বর্ণনা আছে?

উত্তরঃ (১) হাশরের বিচার অনুষ্ঠান-

হাদীসে আছে কেয়ামতের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর আতঙ্কগ্রস্থ মানুষ একে একে সকল নবীকে অনুরোধ করবেন- তাঁরা যেন সহজে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন। কিন্তু আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবী একাজ করতে অস্বীকার করবেন এবং উম্মতদেরকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে যেতে বলবেন। উম্মতরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে গেলে তিনি তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহকে বিচার শুরু করতে অনুরোধ করবেন। এ অবস্থায় বিচার শুরু হবে।

উত্তরঃ (২) বিচারের ময়দানে যা যা ঘটবে-

হাশরের ময়দানে বিচার কাজ কিভাবে পরিচালিত হবে এ বিষয়ে কুরআনের অসংখ্য উদ্ধৃতি থেকে নীচের তথ্যগুলো পাওয়া যায়–

(ক) সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিচার করা হবে।
(খ) যদিও আল্লাহ হিসেব-নিকেশ করে রায় দিবেন তবুও রায়ের পূর্বেই প্রত্যেক মানুষ তার পাপ-পূণ্য স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে।
(গ) মানুষের সকল ভাল ও খারাপ কাজের 'রেকর্ড' (আমলনামা) রাখা হয়। এ (আমলনামা) বিচারের দিনে প্রকাশ করা হবে। সৎকর্মশীলদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে আর অসৎ ব্যক্তিদের আমলনামা বাম হাতে অথবা পেছন দিয়ে দেয়া হবে। এই আমলনামা হবে পূর্ণাঙ্গ এবং অভ্রান্ত। জীবনের সকল ভাল ও মন্দ কাজের বিস্তারিত বিবরণ তাতে থাকবে। কোন বিষয়ই বাদ যাবে না।
(ঘ) মানুষের নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গ তার পক্ষে বা বিপক্ষে সেদিন সাক্ষ্য দেবে।
(ঙ) সেখানে একটি দাঁড়িপাল্লা থাকবে যার নাম 'মিজান'। সেই 'মিজান'-এর এক পাল্লায় মানুষের সৎকাজ এবং অপর পাল্লায় খারাপ কাজ রেখে মাপা হবে। অবশ্য আল্লাহর মাপ দুনিয়ার মাপের মত নয়। যেমন কেউ ভাল কাজের নিয়ত করলেই তার হিসাবে তা উঠে যায়। পরে সে ভাল কাজ করলে তার সওয়াব আল্লাহ তাঁর দয়ায় ৭ থেকে ৭০০ গুন বাড়িয়ে ধরেন। নিয়তের পর ভাল কাজ না করলেও তার হিসাব বাদ যায়

না। অপর দিকে কেউ খারাপ কাজের নিয়ত করে তা না করলে তার হিসেবে কোন কালো দাগ পড়ে না। আর খারাপ কাজ করলে হিসেবে একটি দাগ পড়ে।

উত্তরঃ (৩) আল্লাহর দয়া-

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর দয়া ছাড়া শুধু নেক আমল দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করা যাবে না। তবে এই দয়া আল্লাহ উপযুক্ত লোককেই করবেন। আন্তরিকতা ও চেষ্টা থাকার পরও যাদের সৎ কাজে একটু ঘাটতি হবে তাদের প্রতিই আল্লাহ দয়ার হাত বাড়াবেন। আল্লাহর দয়া অপাত্রে দান করা হবে না। অন্যান্য ধর্মেবিশ্বাসীদের মত এই দয়া মজলুমের সাথে জালিমেরও মুক্তির উসিলা হবে না।
হাদীসে আছে যেসব সৎ ঈমানদারের হিসেবের পর নেকীর চেয়ে ভুলের পরিমাণ সামান্য বেশি হবে তাদের আল্লাহ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তারা যখন ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইবে তখন আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

উত্তরঃ (৪) বিচারের পর-

বিচারের পর মানুষকে দোজখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা এক অতি সরু ও জটিল রাস্তা (পুলসিরাত) পার হতে হবে। এখানেও সৎকর্মশীলরা অতি সহজে এই পুল অতিক্রম করে বেহেশতে চলে যাবে। আর অসৎরা পুল থেকে নীচে দোজখের আগুনে পড়বে। ইসলামে সিরাত-এর ধারণা অত্যন্ত কেন্দ্রীয়। মুসলমানরা দিনে অন্ততঃ ২৫ বার 'সরল পথে' (সিরাত) চলার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়।

উত্তরঃ (৫) (৬) দোজখ ও বেহেশত-

কুরআনে বেহেশত ও দোজখের বর্ণনা আছে। বেহেশত সৎকর্মশীলদের জন্য আর দোজখ অসৎদের জন্য।

দোজখ	বেহেশত
প্রচণ্ড তপ্ত আগুন যাতে পাপীরা নিক্ষিপ্ত হবে	সুস্বাদু খাঁটি দুধ হবে পানীয়। সুমিষ্ট স্বচ্ছ পানির ঝরণা থাকবে।
সেখানে খাদ্য হবে কাঁটা যা পাকস্থলীকে বিদীর্ণ করবে।	খাদ্য হিসেবে থাকবে পুষ্টিকর স্বাদে অতুলনীয় ফল ও মধু।
ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে।	পোষাক হবে খাঁটি রেশমের।
এই কষ্টের কোন শেষ নেই।	সুরম্য প্রাসাদের নীচে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণা।
এই দহনের কোন শেষ নেই।	দামী পাথর ও স্বর্ণ খচিত থাকবে প্রাসাদে।
বিরতিহীন শাস্তি চলবে।	আপনজন ও পবিত্র স্ত্রী/স্বামী, এবং সাথীদের নিয়ে সুখে দিন কাটাবে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ১৭ঃ৭৯

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৪০ঃ১৭, ৩ঃ১৮২, ৪ঃ৪০, ১৭ঃ১৩-১৪, ৮২ঃ১০-১২, ৫০ঃ১৮, ২৪ঃ২৪, ৩৬ঃ৬৫, ৪১ঃ২২, ২১ঃ৪৭, ১০১ঃ৬-১১

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ১১ঃ১১৪, ৮৪ঃ৮

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৪৭ঃ১৫, ১৮ঃ২৯, ২২ঃ২২, ৭ঃ৪১, ২০ঃ৭৪, ৮৭ঃ১৩, ৪ঃ৫৫

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ৫৬ঃ১৭-১৯, ৯ঃ৭২

ডি-১২ শাফায়াত ও প্রসঙ্গ কথা

প্রশ্ন- (১) দোজখবাসীদের কি সেখানে চিরকাল থাকতে হবে নাকি তাদের মুক্তির কোন সুযোগ আছে?

প্রশ্ন- (২) মুসলমানরা কি মধ্যস্থতায় বিশ্বাস করে? (অর্থাৎ কেউ কারো পক্ষ হয়ে তার মুক্তির জন্য আল্লাহর সাথে মধ্যস্থতা করবে)

প্রশ্ন- (৩) কেউ কি তার বেহেশতে যাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারে?

প্রশ্ন- (৪) শুধুমাত্র ঈমান আনলেই কি বেহেশতে যাওয়া যাবে?

প্রশ্ন- (৫) পশুদেরও কি পুনরুত্থান এবং বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে?

প্রশ্ন- (৬) পরকালে বিশ্বাস মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কি প্রভাব ফেলে?

উত্তরঃ (১) দোজখবাসীদের মেয়াদ প্রসঙ্গে-

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে একথা স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, যারা নির্দ্বিধায় আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং বদকাজ করে তাদের চিরকাল দোজখে থাকতে হবে। একটি হাদীসে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "যার অন্তরে কণা পরিমাণ ঈমান এবং কোমলতা আছে এবং যে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ তাদের সবাইকে দোজখের আগুন থেকে বের করে আনবেন।"
এতে মনে হয় যারা পাপ কাজ করে মারা গেছে কিন্তু তাদের অন্ততঃ আল্লাহর বিশ্বাস ছিল এবং কিছু সৎকাজ করেছে তাদের কিছুকাল দোজখের শাস্তির পর একসময় বেহেশতে যাবার সুযোগ হবে। অবশ্য এতে কোন অসৎ নিয়তের মানুষের উৎসাহিত হবার কারণ নেই। এমন নয় যে দোজখের শাস্তি মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী হবে। কারণ প্রথমতঃ কেউই একথা বলতে পারে না যে দোজখের শাস্তির মেয়াদটা কত দীর্ঘ হবে। দ্বিতীয়তঃ দোজখের শাস্তির এক একটি সেকেন্ড পৃথিবীর বছরের চাইতেও দীর্ঘ হবে। মানুষের পৃথিবীর জীবনকাল পরলোকের একটি সকাল বা বিকেলের চেয়েও ছোট হবে।

উত্তরঃ (২) মধ্যস্থতা-

মুসলমানরা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন মধ্যম ব্যক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সরাসরি। কেউ কারো পক্ষ নিয়ে আল্লাহর সাথে কোন দেন দরবার করতে বা দাবী দাওয়া পেশ করতে পারবে না। এমনকি নবীরাও না। তবে মুসলমানরা শাফায়াতে বিশ্বাস করে। যার অধিকার একমাত্র রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) রাখেন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারেন।
অবশ্য এই শাফায়াতের ধারণা ব্যক্তির জবাবদিহিতাকে প্রত্যাখ্যান করে না। যোগ্য বান্দার জন্যই শাফায়াত করা হবে। কিভাবে আল্লাহর দয়া এবং ক্ষমা অর্জন করতে হয় তা ইসলামে স্পষ্ট করে বলা আছে।
আল্লাহর সাথে সব বান্দার সম্পর্ক উন্মুক্ত। কেউ কোন ভুল বা অন্যায় করলে তাকে তওবা করতে বলা হয়েছে। অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ তার ক্ষমার গুণে ক্ষমা করেন। আল্লাহ তওবাকারীর সব ভুল মাফ করেন শুধুমাত্র শিরকের গোনাহ ছাড়া।

উত্তরঃ (৩) (৪) বেহেশতের নিশ্চয়তা-

বেহেশতে যাবার কথা কেউই নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না। হাদীসে রাসুল (সাঃ) বলেন তোমাদের কেউই শুধুমাত্র তার নেক আমল দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা শুনে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "এমনকি আপনিও," জবাবে রাসুল (সাঃ) বললেন, "এমনকি আমিও যদিনা আল্লাহ আমাকে তাঁর ক্ষমার সুযোগ দান করেন।" এখানে সব বিশ্বাসীর জন্য শিক্ষনীয় কথা রয়েছে। যদি মানুষ তার বেহেশতে যাবার বিষয়ে নিশ্চিত থাকত তবে তার খোদাভীতি লোপ পেত। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার নিরন্তর চেষ্টা সে বাদ দিত। তার দ্বারা মানবতার কল্যাণের আশা দূর হতো।

অন্যদিকে কারো পক্ষে এটাও সঙ্গত নয় যে সে সবসময় আল্লাহ্‌র রহমতের উপর হতাশ হয়ে থাকবে। সে ভাববে যে তার সৎকাজ তার কোন কাজে আসবে না। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন যে যারা সত্য-সরলপথে থাকবে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছেমত চলবে, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ও সাহায্য চাইবে তাদের জন্য তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলে বিশ্বাসী মুসলমান হলেই বিনা বিচারে বেহেশত পাবার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ যেখানে শুধু সৎকাজই এই নিশ্চয়তা দিতে পারে না। সেখানে শুধু বিশ্বাসের গুণে এটা আশা করা যায় না। বরং এমন সুযোগ থাকলে ঈমানদাররা সৎকাজের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে যেত। শুধু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মৎ হলেই বেহেশতে যাওয়া যাবে এমন ভাবাটা ইতিপূর্বের নবীদের উম্মতদের প্রতি অবিচারের শামিল এবং আদৌ ইসলাম সম্মত নয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে কেউই বেহেশতে যাবার বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না। বরং যে একথা বলবে সে প্রকারান্তরে এক প্রকার শিরক করবে। কারণ একমাত্র আল্লাহই এই নিশ্চয়তা দিতে পারেন।

উত্তরঃ (৫) পশুদের প্রসঙ্গ-

কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে হাশরের ময়দানে পশুরাও জমায়েত হবে। তবে তাদের কোন বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না। বিচার শুধু জ্বীন ও মানুষেরই হবে। কারণ এই দুই জাতিকে ভাল মন্দ যাচাই করার বিবেক দেয়া হয়েছে। ভাল বা মন্দ যে কোন পথে চলার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

উত্তরঃ (৬) জীবনের উপর আখেরাতের বিশ্বাসের প্রভাব-

আখেরাতের উপর বিশ্বাস মুসলমানদের শুধু সাধারণ বিশ্বাস নয়। বরং এটা গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে।

(ক) এটা মুসলমানদের ন্যায়নীতির উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকতে অনুপ্রাণিত করে। কারণ তারা জানে যারা অন্যায় করে এই দুনিয়ায় পার পেয়ে যায় তাদের আখেরাতে পাকড়াও করা হবে। ধার্মিক ও সৎ লোক যারা দুনিয়াতে কষ্ট করে তারা আখেরাতে সুখে থাকবার নিশ্চয়তায় সন্তুষ্ট থাকে।

(খ) মুসলমানরা তার নিজের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত ও মার্জিত করে। কারণ সে জানে যে জীবন অর্থহীন লক্ষ্যহীন নয়। বরং এটা আখেরাতের জন্য পরীক্ষাস্থল। সেই জীবনে সফলতা পেতে হলে এই জীবনে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে।

(গ) আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি মুসলমানদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উত্তরোত্তর বাড়াতে অনুপ্রাণিত করে। তারা বস্তুবাদী না হয়ে আধ্যাত্মবাদী হয়।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৮৭ঃ১৩, ২২ঃ৪৭

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ৭৪ঃ৩৮, ৪ঃ৪৮, ২ঃ২২৫, ২১ঃ২৮

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৮১ঃ৫

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৪৫ঃ২১, ৩৮ঃ২৮

ডি-১৩ তাকদীরে বিশ্বাস

প্রশ্ন- (১) মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে পূর্বনির্ধারিত তাকদীরের (ভাগ্যের) সম্পর্ক কি?

প্রশ্ন- (২) ভাগ্য এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়ে দার্শনিক ও যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৩) 'ভাগ্য'-এর বর্ণনায় কুরআনে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে? এর প্রকৃত অর্থ কি?

প্রশ্ন- (৪) আমাদের ভাগ্য ও কর্ম যদি আল্লাহর জানাই থাকে তবে পাপের জন্য শাস্তির প্রশ্ন আসে কেন?

প্রশ্ন- (৫) কুরআনে বলা হয়েছে যে আল্লাহই মানুষকে হেদায়েত দেন। তাহলে আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন না তার শাস্তির কথা আসে কেন?

প্রশ্ন- (৬) যারা বলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাকলে আল্লাহকে দয়াবান বলি কিভাবে- তাদের প্রশ্নের জবাবে কি বলবেন?

প্রশ্ন- (৭) তাকদীরে বিশ্বাসের কি প্রতিফলন মুসলমানদের জীবনে দেখা যায়?

উত্তরঃ (১) ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ভাগ্য (তাকদীর)-

এই প্রশ্ন মানুষের মনে সব সময় এসেছে। সে কি পূর্ণ স্বাধীন সত্তা যে ইচ্ছেমত নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারে। নাকি সে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলছে। যদি সে ইচ্ছেমত ভাগ্য গড়ার অধিকারী হয় তাহলে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের বিষয়টি কেমন হয় যেখানে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি সমগ্র জগতে একচ্ছত্র ক্ষমতাবান হিসেবে সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল খবর রাখেন। অন্যদিকে মানুষ যদি সম্পূর্ণরূপে ভাগ্য দিয়েই চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তার এই ইহজীবনের কাজের জন্য কেন পরকালে জবাবদিহি করতে হবে?

উত্তরঃ (২) 'ভাগ্য' সম্পর্কে দার্শনিক ও যুক্তিবিদদের মত-

ভাগ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দার্শনিক ও যুক্তিবিদরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন–

(ক) একদল মনে করে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীনভাবে মানুষ কাজ করার পর আল্লাহ তা জানতে পারেন। কোন কোন দার্শনিক আরও চরমপন্থী হয়ে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন। তারা বলেন যে, যেখানে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়তে পারে সেখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয়।

(খ) আর একদল দার্শনিক বলেন যে, মহান স্রষ্টা যিনি সমগ্র জগতের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সব কিছু জানেন তখন জগতে কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছা ছাড়া অনুষ্ঠিত হতে পারে না। কাজেই মানুষের কাজ ও আচরণের জন্য মানুষ দায়ী নয় বরং স্রষ্টাই মানুষকে দিয়ে ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নেন।

উত্তরঃ (৩) 'ভাগ্য' বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা-

পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য বনাম ইচ্ছার স্বাধীনতা এ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবনে অনেক মুসলমানও ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে প্রচলিত ভ্রান্তি এই যে, ইসলাম মুসলমানদের ভাগ্যবাদী হতে

উৎসাহিত করে। এর কারণ কুরআনে ভাগ্য সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যবহৃত 'আল-কদর' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। কুরআনে 'কদর' বলতে পূর্ব নির্ধারিত নিয়তিকে বোঝায় না। 'কদর' শব্দের মূল ধাতুর অর্থ মূল্যায়ন, ন্যায্য পাওনা বা বিচার। সূত্রে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলো অধ্যয়ন করে দেখা যায় কদর বলতে নিয়তিকে বোঝানো হয়নি। বরং আল্লাহ জগতকে কিছু সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীন করে তৈরী করেছেন তাকেই বোঝানো হয়েছে। যার অর্থ প্রথমতঃ যে নিয়মের অধীনে জগৎ পরিচালিত হয় যেমন চাঁদ, সূর্য, বাতাস পৃথিবীর যে শৃঙ্খলায় সমাজ পরিচালিত হবে তাও নির্ধারিত।

উত্তরঃ (৪) পাপের শাস্তি প্রসঙ্গে-

এটা ভাবা ভুল যে পৃথিবীতে কোন কিছু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে। এমন বলাটা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা হবে। আবার আমরা যত পাপ কাজ করি তাও আল্লাহর ইচ্ছায় করা হয়েছে এমন বলাটাও অবান্তর। এ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে আমাদের জীবনের যেসব ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার নিয়ন্ত্রনে আর যেসব ক্ষেত্র আমাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে তা জানা দরকার। সেসব বিষয়ে আমাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই সেগুলো হচ্ছে–

(ক) আমরা যে সময় জন্মগ্রহণ করেছি।
(খ) আমাদের গায়ের রং।
(গ) আমাদের চেহারা ও চাহনি।
(ঘ) আমাদের হৃদপিণ্ড যেভাবে স্পন্দন করে ইত্যাদি।

অন্য কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের ইচ্ছার অধীন সেগুলো হচ্ছে–

(ক) কোন মানুষকে দয়া সহানুভূতি দেখানো অথবা তার সাথে শত্রুতা করা।
(খ) আল্লাহতে বিশ্বাস করা বা না করা।
(গ) সৎ সত্য পথ অনুসরণ করা বা না করা ইত্যাদি।

এসব কাজ করা না করার উপর আমাদের পুরস্কার বা শাস্তি নির্ভর করছে।

উত্তরঃ (৫) হেদায়েত পাওয়া না-পাওয়া প্রসঙ্গে-

কেউ কেউ বলে যে আল্লাহ তাদের হেদায়েত না করলে তাদের কি দোষ। কেন তাদের শাস্তি পেতে হবে। এমন লোকদের কথার জবাব এভাবে দেয়া যেতে পারে–

(ক) তারা যদি ভাল মানুষ হতেন এবং হাশরের ময়দানে পুরস্কৃত হতেন তবে কি তারা এই প্রশ্ন করতেন, "আমাকে কেন বেহেশতে দেয়া হল, আল্লাহই তো আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন, এখানে আমার কৃতিত্বটা কোথায়।" এটাই যদি হয় বাস্তবতা তবে মন্দ পরিণামের জন্য তাদের অভিযোগ করাটা prejudice-এরই বহিঃপ্রকাশ।

(খ) মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক মানুষের মাঝে আল্লাহ সহজাত সত্যের অনুসন্ধিৎসা দিয়েছেন। এটাকে বলা হয় 'ফিতরাত'। এছাড়াও মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান। তাদের জন্য পাঠিয়েছেন নবী এবং ওহী। কিছু মানুষ এসব এর মাধ্যমে সত্য পন্থা বেছে নেয়। কেউ কেউ স্বাধীনতার সুযোগে সত্য প্রত্যাখ্যান করে। তারা শয়তানীতে লিপ্ত হয়। তাদের সত্যপথ গ্রহণ না করার জন্য এরা নিশ্চয়ই আল্লাহকে দোষারোপ করতে পারে না।

উত্তরঃ (৬) আল্লাহর দয়া প্রসঙ্গে-

আল্লাহর জ্ঞানের বিষয়ে আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে আমরা ধারণাও করতে পারি না। স্থান, কাল, পাত্রের উর্দ্ধে উঠে যে কোন বিষয়ের লাভ-ক্ষতি উপকার-অপকার আমরা বুঝতে পারিনা। আমাদের চোখে যা এই মুহূর্তের ক্ষতি বা কষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় সময়ে সেটাই কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। কাজেই সবকিছুতেই নগদ কল্যাণ দেখে আল্লাহর দয়া সম্পর্কে আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে চিন্তা করতে গেলে আমরা শয়তানের ধোকায় পড়তে পারি।

এটা বলা যেতে পারে পৃথিবীতে যদি দুঃখ কষ্ট না থাকতো তবে সুখ কি জিনিস তা আমরা বুঝতাম না। তেমনি যদি মন্দ না থাকতো তবে আমরা ভাল কে চিনতাম না। অসুস্থতা না থাকলে আমরা স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বুঝতাম না। মৃত্যু না থাকলে জীবনকে এত ভাল লাগত না।

উত্তরঃ (৭) মুসলমানদের উপর তাকদীরে বিশ্বাসের প্রভাব-

তাকদীরে বিশ্বাসের কারণে মুসলমানরা ভবিষ্যত নিয়ে খুব পেরেশান হয় না। কারণ তারা জানে যে, আল্লাহ যা নির্ধারিত রেখেছেন তাই হবে। আবার তারা এও বিশ্বাস করে যে তাকদীর-এর অস্তিত্ব মানে এই নয় যে মানুষের চেষ্টা বা পছন্দের কোন গুরুত্ব নেই। বস্তুতঃ মানুষের জন্য ভাগ্যের অনেক ব্যাপক সীমা (Range of distribution) রয়েছে। সে চেষ্টা ও আমল দিয়ে শ্রেষ্ঠটাকে পছন্দ করবে। মন্দকে বর্জন করে আল্লাহর উপর সব বিষয়ে নির্ভরতা রাখবে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৫৪ঃ৪৯, ২৫ঃ২, ৩৬ঃ৩৯, ১৭ঃ৭৭

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ৯১ঃ৯-১০, ২ঃ২

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ২১ঃ২৯

প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ৫৭ঃ২২

ডি-১৪ আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর বিশ্বাস

প্রশ্ন- (১) রিসালাতে বিশ্বাসের সাথে কিতাবে বিশ্বাসের সম্পর্ক কি?

প্রশ্ন- (২) অন্যান্য নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করতে কুরআনে আদেশ করা হয়েছে কি?

প্রশ্ন- (৩) কুরআনে কি কোন আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

প্রশ্ন- (৪) কুরআনে নাম উল্লেখ নেই যেসব কিতাবের সেগুলোর বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী কি?

প্রশ্ন- (৫) আসমানী কিতাবে বিশ্বাসের অর্থ কি এই যে এসব কিতাবের বর্তমান সংস্করণকেও বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে হবে?

প্রশ্ন- (৬) পূর্বের কিতাবগুলো যে অবিকৃত নেই এ বিষয়টি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে কি?

প্রশ্ন- (৭) কুরআন যে অবিকৃত অবস্থায় আছে তা মুসলমানরা কিভাবে প্রমাণ করবে?

উত্তরঃ (১) (২) রিসালাত ও কিতাবে বিশ্বাসের সম্পর্ক-

এটা স্বাভাবিক যে যদি মুসলমানরা আল্লাহ্‌র সব নবীকে বিশ্বাস করে তবে তাঁদের কিতাবকেও বিশ্বাস করতে হবে। এটা যৌক্তিক দাবী নয় বরং বাধ্যবাধকতা কারণ সব নবীই আল্লাহ প্রেরিত ছিলেন। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। তাঁদের প্রত্যেকের উপর একই বিধান দেয়া হয়েছিল। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ। কুরআন ও হাদীস থেকে দেখা যায় যে, অন্যান্য নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

উত্তরঃ (৩) (৪) কুরআনে আর যেসব আসমানী কিতাবের নাম এসেছে–

কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত চারটি কিতাবের নাম এসেছে। এগুলো হচ্ছে–

- ইব্রাহীম (আঃ)কে প্রদত্ত সহীফা।
- দাউদ (আঃ)কে প্রদত্ত যবুর।
- মুসা (আঃ)কে প্রদত্ত তাওরাত।
- ঈসা (আঃ)কে প্রদত্ত ইঞ্জিল।

অবশ্য এর মানে এই নয় যে এই চারটি কিতাবই আছে। কুরআনের বহু আয়াতে 'কুতুব' শব্দ এসেছে। 'কুতুব' হচ্ছে কিতাবের বহুবচন।

কুরআনে যেসব কিতাবের নাম উল্লেখ নেই সেগুলোর উপরও মুসলমানদের ঈমান রাখতে হবে।

উত্তরঃ (৫) (৬) কিতাবগুলোর বর্তমান সংস্করণের ব্যাপারে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী-

যখন মুহাম্মদ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলো যে মুসলমানরা কিতাবগুলোর বর্তমান সংস্করণ সম্পর্কে কি আচরণ করবে। তখন তিনি বললেন যে, কেউ যেন এগুলো পুরোপুরি গ্রহণ না করে আবার একেবারে বর্জন না করে। অর্থাৎ এগুলো সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল অথচ সচেতন হতে হবে। এর কারণ এসব কিতাবের বর্তমান সংস্করণগুলোয় আল্লাহ্‌র ওহী অবিকৃত থাকেনি। ইসলাম এসব কিতাবের অবিকৃত রূপ যা সংশ্লিষ্ট রাসুলের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস রাখতে

বলে। এসব কিতাব যে বিকৃতির শিকার হয়েছে তা কুরআন বলেছে। এসব কিতাবের অনেক অসঙ্গতি সাধারণ মানুষেরও চোখে পড়ে। যথা–

(ক) নিউ টেস্টামেন্ট প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধানের অনেক পর তাঁর সহযোগিদের বয়ানে লিখা তাঁর জীবনী ও উপদেশের সংকলন। অবশ্য এতে তাঁর উপর নাযিলকৃত কিছু ওহী থেকে যেতে পারে। কিন্তু প্রচুর মানবীয় কথাবার্তার অনুপ্রবেশ আল্লাহর কিতাবের মানকে ম্লান করেছে।

(খ) ওল্ড টেস্টামেন্টের বিশ্লেষণ করেও দেখা যায় যে, এর বিরাট অংশ মুসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর লিখা হয়েছে। 'pentateuch'-এর পাঁচটি গ্রন্থের অসঙ্গতি প্রমাণ করে যে এখানে মানুষের কথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

উত্তরঃ (৭) কুরআন যে অবিকৃত তার প্রমাণ-

(ক) আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি নিজে কুরআনকে সংরক্ষণ করছেন।

(খ) রাসুলের জীবদ্দশায় নাযিলের সাথে সাথে কুরআনের প্রতিটি আয়াত অবিকল লিখে রাখা হত এবং তা সংরক্ষণ করা হত।

(গ) তাসখন্দ এবং তুরস্কে রাসুলের মৃত্যুর কয়েক বছর পরের কুরআন শরীফ সংরক্ষিত আছে। বর্তমানের কুরআনের সাথে যার কোন অমিল নেই।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ২১ঃ২৫

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ২ঃ৪-৫, ২ঃ২৮৫, ২ঃ১৩৬

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৮৭ঃ১৮-১৯, ৫৩ঃ৩৬-৩৭, ১৭ঃ৫৫, ৪ঃ১৬৩, ৫ঃ৪৭, ৫ঃ৪৯, ৫ঃ৬৮, ৩ঃ৩,

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ২ঃ২১৩

প্রশ্ন- (৬) আল কুরআন ৫ঃ১৬-১৭, ২ঃ৭৫, ৪ঃ৪৬, ৫ঃ১৪, ৬ঃ৯১, ৬১ঃ৬, ৫ঃ৫১, ১৬ঃ৬৪

প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ১৫ঃ৯, ৪১ঃ৪১-৪২

ইসলামের স্তম্ভসমূহ

ই-১ প্রথম স্তম্ভ কালেমা (শাহাদাত)

প্রশ্ন- (১) ইসলামের পাঁচটি রুকন (স্তম্ভ) কি কি? এই পাঁচ স্তম্ভের ধারণা কোথা থেকে উদ্ভূত?
প্রশ্ন- (২) এই পাঁচ স্তম্ভেই ইসলাম সীমাবদ্ধ- এমন ধারণা অনেকে দিতে চান- এটা কি ঠিক?
প্রশ্ন- (৩) ইসলামের স্তম্ভগুলো যে ক্রমানুসারে বর্ণনা করা হয়েছে তার কি কোন গুরুত্ব আছে?
প্রশ্ন- (৪) ইসলামের প্রথম স্তম্ভের অর্থ ও গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৫) কালেমার প্রথম অংশ 'আল্লাহর উপরে বিশ্বাস' সম্পর্কে ইসলাম কি বলেছে?
প্রশ্ন- (৬) কালেমার দ্বিতীয় অংশ (রিসালাতে বিশ্বাস)-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা কি?
প্রশ্ন- (৭) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনার সাথে কি অন্যদের উপরও ঈমান এসে যায়?
প্রশ্ন- (৮) ইসলামের প্রথম স্তম্ভের সাথে যুক্ত অন্যান্য বিশ্বাসগুলো কি কি?
প্রশ্ন- (৯) কালেমার সাথে অন্যান্য যেসব বিষয়ে বিশ্বাস আনতে হবে তার পক্ষে কুরআন বা হাদীসের কোন দলিল আছে কি?

উত্তরঃ (১) ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ-

বিভিন্ন হাদীসে রাসুল (সাঃ) ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাওহীদ (আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস), নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ্ব এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মা'বুদ না মানা এবং একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা। দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে নির্ধারিত নিয়মে দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করা। তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। রমজান মাসে রোজা রাখা হচ্ছে ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। আর পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার হজ্ব করা।

উত্তরঃ (২) ইসলামী শিক্ষায় পাঁচ স্তম্ভের স্থান-

ইসলাম ছাড়া প্রায় সব ধর্মই ব্যক্তিজীবনকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন থেকে পৃথক রাখে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব কিছু নয়। এখানে এমন সুযোগ নেই যে, ধর্মীয় কাজগুলো যথানিয়মে পালন করে তারপর ইচ্ছেমত জীবন পরিচালনা করা যাবে। যারা মনে করেন পাঁচটি স্তম্ভ পালন করলেই ইসলামের কাজ শেষ হয়ে যায় তারা ভুল করেন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা জীবনে প্রত্যেক অংশকেই প্রভাবিত করে। একটি পূর্ণাঙ্গ বাড়ী তৈরী হতে ভিত্তি, স্তম্ভ, দেয়াল, দরজা, জানালা, ফার্ণিচার ইত্যাদি অনেক কিছু লাগে। শুধু স্তম্ভ দিয়ে যেমন বাড়ী হয় না তেমনি শুধু পাঁচ স্তম্ভ পূর্ণ করলেই ইসলাম বাস্তবায়ন করা হয়ে

যায় না। স্তম্ভগুলো ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইসলাম নয়।

উত্তরঃ (৩) পাঁচ স্তম্ভের বর্ণনার ক্রমের গুরুত্ব-

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি। এই আল্লাহতে বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের সকল ভাল কাজ কবুলের অত্যাবশ্যক শর্ত। দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ। এটা আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এর জন্য কোন যাজক বা মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে স্বীকার করে তাকে মানার পর তাঁর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম হচ্ছে নামাজ। তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। যা গরীবের প্রতি দয়া নয় বরং তাদের অধিকার। ধনীদের নিজেদের উদ্যোগ নিয়ে এটা আদায় করতে হবে। এটা সমাজে সাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে। রোজার মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করে। ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে হজ্ব। যারা মক্কায় যাবার সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য এটা ফরজ। এভাবে ইসলামে গুরুত্বের ভিত্তিতে তার স্তম্ভগুলো সাজানো হয়েছে।

উত্তরঃ (৪) প্রথম স্তম্ভের অর্থ ও ব্যাখ্যা-

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে সচেতন ও আন্তরিকভাবে এই ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ এক এবং একমাত্র উপাস্য আর মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দাহ ও রাসুল (বাণীবাহক)।

এই বিশ্বাস ও ঘোষণা এক সার্বজনীন অধিকার। যে কেউ যে কোন স্থানে এই ঘোষণা দিতে পারে। এর জন্য গীর্জা বা মসজিদে গিয়ে পাদ্রী বা আলেমের অনুমোদন নিতে হয় না। এ ঘোষণা অন্তর থেকে যে যখন দেবে তখন থেকেই সে ইসলামে প্রবেশ করে মুসলিম হয়।

উত্তরঃ (৫) আল্লাহর উপর বিশ্বাস প্রসঙ্গে-

ইসলামের মূল কালেমা 'না বাচক' ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে। কারণ 'একজন আল্লাহ' আছে শুধু এই ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট নয়। বরং এই ঘোষণা দেয়াও জরুরী যে তাবৎ জগতে কোন সৃষ্টি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতায় কোন অংশ রাখে না। কুরআন বলে যে, আল্লাহ–

(ক) সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

(খ) সর্বোচ্চ একক এবং সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তাঁর কোন অংশীদার বা সাহায্যকারী নেই।

(গ) তাঁর শক্তি ক্ষমতা ও ব্যাপকতা আমাদের অনুমান শক্তির সীমার বাইরে।

(ঘ) সবসময়ে সব স্থানে তিনি আমাদের পাশে থাকেন, পরিচালিত করেন, সাহায্য করেন ও আমাদের ভালবাসার জবাব দেন।

উত্তরঃ (৬) কালেমার দ্বিতীয় অংশ-

আল্লাহ নবী-রাসুলদের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশনা মানুষকে দেন। আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সব নবী আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মিশন ছিল পূর্বের সব নবীর মিশনকে স্বীকৃতি ও পূর্ণতা দেয়া।আল্লাহর বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

কালেমার দ্বিতীয় অংশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে নবুওয়তের মিশনের এবং বিশেষভাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শেষ নবুওয়তের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

উত্তরঃ (৭) রাসুল (সাঃ)কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস-

মুহাম্মদ (সাঃ)কে রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করা মানে অন্য নবীদের অস্বীকার করা নয়। কুরআন সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখাকে মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বলেছে। সকল নবীই একই ভ্রাতৃত্বের অংশ। কুরআনে কোন নবীর উপরে দোষ বা পাপ আরোপ করা হয়নি। সব নবীর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে কুরআনে বিশেষভাবে পাঁচজনের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হলেন, নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ)।

উত্তরঃ (৮) (৯) অন্যান্য যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে-

কালেমার উপর ঈমানের ফলশ্রুতিতে ছয়টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তা হচ্ছে যথা–

(ক) আল্লাহতে বিশ্বাস।
(খ) ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস।
(গ) আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস।
(ঘ) আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসুলদের উপর বিশ্বাস।
(ঙ) বিচারের দিনের (হাশর) উপর বিশ্বাস।
(চ) তাকদীর (ভাগ্য)-এর উপর বিশ্বাস।

রাসুলের একটি হাদীসে এসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে (হাদীসে জিবরীল)।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ২ঃ২৫৫, ৪২ঃ১১, ৬ঃ১০৩, ৪ঃ১১২, ৫০ঃ১৬
প্রশ্ন- (৭) আল কুরআন ২ঃ২৮৫
প্রশ্ন- (৮) এবং (৯) আন্‌নববী সঙ্কলিত চল্লিশ হাদীসের হাদীসে জিবরীল।

ই- ২ দ্বিতীয় স্তম্ভ ঃ সালাত (নামাজ)

প্রশ্ন- (১) ইংরেজী Prayer শব্দ দিয়ে কি সালাত শব্দের পুরো অর্থ হয়?
প্রশ্ন- (২) অযু কিভাবে করতে হয়?
প্রশ্ন- (৩) অযু বিশেষ নিয়মে করতে হয় কেন?
প্রশ্ন- (৪) এক অযুতে কতবার নামাজ পড়া যাবে?
প্রশ্ন- (৫) অক্ষম লোকের জন্য অযুর কোন বিকল্প আছে কি?
প্রশ্ন- (৬) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অযু যথেষ্ট হবে না? (অর্থাৎ অযু করলেই পবিত্রতা হবে না গোছল লাগবে)
প্রশ্ন- (৭) অযু, গোসল ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা ইসলামে কি একটু বেশীই করা হয়েছে?
প্রশ্ন- (৮) পবিত্রতা সম্পর্কে ইসলামে আর কিছুর উল্লেখ আছে কি?

উত্তরঃ (১) সালাত বা নামাজের অর্থ-

নামাজ একটি ব্যাপক এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার সমষ্টি যার অর্থ ইংরেজী Prayer শব্দ দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। Prayer শব্দ দিয়ে শুধু প্রার্থনা বা আবেদনকেই বুঝায়। অন্যদিকে প্রার্থনা নামাজের একটি অংশ কিন্তু পুরো নামাজ নয়। নামাজের পূর্বে অজু করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। নামাজে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মে উঠা-বসা করতে হয়। কুরআন তেলাওয়াতসহ আরো কিছু আনুষ্ঠানিকতা করতে হয়।

উত্তরঃ (২) অযু-

অযুর ন্যূনতম চাহিদা (ফরজ) হচ্ছে একজন মানুষ তার কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে মুখ ধুয়ে সিক্ত দুই হাত দিয়ে মাথা মুছবে এবং পা (Foot) ধুবে। এটা নামাজে দাঁড়াবার অন্যতম পূর্বশর্ত। রাসুল (সাঃ)-এর বয়ানে জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে অযুর আরও বিস্তৃত এবং শুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে–

(ক) দুই হাত (Hand) কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।
(খ) তিনবার কুলিসহ দাঁত পরিস্কার করা।
(গ) তিনবার নাসারন্ধ্র পরিস্কার করা।
(ঘ) কপাল ও কানের গোড়াসহ মুখমণ্ডল তিনবার ধোয়া।
(ঙ) ডানহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।
(চ) বামহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।
(ছ) সিক্ত দুই হাত দিয়ে মাথা, চুল এবং কান তিনবার মোছা (মাসেহ করা)।
(জ) গোড়ালী পর্যন্ত দুই পা তিনবার ধোয়া (প্রথমে ডান পা)।

অযু এবাদাতের অংশ এবং নামাজের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে কুরআনে উদ্ধৃত। এভাবে অযু করার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দিষ্ট আদেশ যথানিয়মে মানা হয় এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়। এই কারণ ছাড়া অযুর আরও কিছু যৌক্তিক গুরুত্ব আছে যথা–

(ক) এটা নামাজের মানসিক প্রস্তুতি। আর নামাজ আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

(খ) দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়। যা দিনের অন্যান্য কাজের একঘেয়েমী থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। আর নামাজের আগে অযু ময়লা ধুলো দূর করে শরীর ও মনকে প্রফুল্ল ও সতেজ করে ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করে।

উত্তরঃ (৩) অযুর বিশেষ নিয়ম প্রসঙ্গে-

অযু নামাজের একটি অংশ। যে নিয়মে অযু করতে বলা হয়েছে তা যৌক্তিকভাবে যথার্থ। কারণ মুখ ধোয়ার আগে হাত ধোয়া উচিৎ এবং বাহু ধোয়ার আগে মুখ ধোয়া উচিৎ। আর পা ধোয়ার আগে মুখ ও বাহু ধোয়া উচিৎ। অযু শুধুমাত্র দৈহিক পবিত্রতার বিষয়ই নয় আধ্যাত্মিক পবিত্রতাও আনে। রাসুল (সাঃ) বলেন, যে মানুষ নামাজের প্রস্তুতিতে যত্নের সাথে অযু করে তার পাপ অযুর পানির সাথে ধুয়ে ভেসে যায়।

উত্তরঃ (৪) অযুর স্থায়িত্ব-

অযু না ভাঙ্গলে প্রত্যেক নামাজের আগে অযু করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য যৌক্তিক কারণেই এক অযুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া সম্ভব হবে না। অযু যেসব কারণে ভাঙে তা হচ্ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে, বা অজ্ঞান হলে বা শরীর থেকে যে কোন কিছু যেমন-বাতাস, রক্ত, বমি বের হলে। এভাবে অযু ভাঙ্গলে পরবর্তী নামাজের আগে আবার অযু করতে হবে।

উত্তরঃ (৫) অক্ষম ব্যক্তির জন্য অযুর বিকল্প-

ইসলামী আইনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অযুর বিকল্প ব্যবস্থা আছে। যেসব ক্ষেত্রে অযু করা অসম্ভব অথবা অযুর সুযোগ দুষ্প্রাপ্য সেসব ক্ষেত্রে করণীয়–

(ক) যদি কোন পথিকের কাছে পর্যাপ্ত পানি না থাকে তবে সে 'তায়াম্মুম' করতে পারে। 'তায়াম্মুম' হচ্ছে প্রতীকি অযু। পাথর বা বালিতে হাত রেখে দু'হাত একত্র করে অতঃপর সেই হাত দিয়ে কনুই পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল মুছে নেয়াই 'তায়াম্মুম'।

(খ) কারো যদি চর্মরোগ বা ঘা থাকে যা পানির স্পর্শে বাড়বে তারা আক্রান্ত স্থানে পানি না লাগিয়ে অযু করতে পারবে। এ ধরনের সমস্যায় 'তায়াম্মুম' করলেও চলবে।

(গ) ভ্রমণে বা কর্মস্থলে যদি পা ভেজানোর সুযোগ না থাকে তবে চামড়ার মোজার উপর ভেজা হাত বুলিয়ে নিলেই চলবে। ভ্রমণের সময় এভাবে ৩ দিন এবং বাড়ীতে ২৪ ঘন্টা পা না ভিজিয়ে থাকা যাবে।

উত্তরঃ (৬) যেখানে নামজের প্রস্তুতি হিসেবে অযু যথেষ্ট নয়-

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনে গোসল আবশ্যক (অযুতে হবে না) যথা–

(ক) স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলে।

(খ) মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব বা সন্তান জন্মের পর নেফাস অবস্থা শেষে।

(গ) স্বপ্নদোষ হলে।

এসব ক্ষেত্রেও পানি পাওয়া না গেলে অথবা রোগ-ব্যাধির কারণে পানি ব্যবহারে অসমর্থ হলে 'তায়াম্মুম' অনুমোদিত।

এসব বাধ্যতামূলক গোসল ছাড়াও রাসূল (সাঃ) বলেন যে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার জুমার আগে গোসল করা উচিৎ।

উত্তরঃ (৭) ইসলামে অযু-গোসলসহ ব্যক্তিগত বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা প্রসঙ্গে-

পাশ্চাত্যে কিছু নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্যেই ধর্ম সীমাবদ্ধ এবং ধর্ম সেখানে এক অপার্থিব বিষয়। সেখানে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব জীবন আলাদাভাবে বিভক্ত। অন্যদিকে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এখানে ধর্মীয় জীবন ও পার্থিব জীবন আলাদা করার সুযোগ নেই। কাজেই পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ জীবনের সব বিষয়েই এখানে বিস্তৃত ও খোলামেলা আলোচনা ও নির্দেশনা আছে। বস্তুতঃ পরিচ্ছন্ন থাকা ইসলামে একটি অন্যতম ধর্মীয় দায়িত্ব।

উত্তরঃ (৮) পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আরো কথা-

ইসলাম শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতাকে দুটো ভিন্ন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে না। আধ্যাত্মিক ও শারীরিক দুই ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার (তাহারাত) কথা ইসলামে বলা হয়েছে। আল্লাহ মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত কল্যাণ চান। রাসূল (সাঃ) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অংশ হিসেবে শুধু অযু গোসলের কথাই বলেননি। আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি নিয়মিত দাঁত মাজতে (মেসওয়াক), মুসলমানী করতে, নখ কাটতে, বগল ও যৌনাঙ্গের চুল কাটতে, খাবার আগে হাত ধুতে, শারীরিকভাবে কর্মঠ থাকতে আদেশ করেছেন। তাছাড়াও তিনি মানুষকে পানিতে বা ছায়াঘেরা স্থানে যেখানে মানুষ বিশ্রাম করে সেখানে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। মদপান করতে তিনি কঠোরভাবে না করেছেন।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (৩) আল কুরআন ৫ঃ৭
প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ৫ঃ৭
প্রশ্ন- (৮) আল কুরআন ৯ঃ১০৮, ২ঃ২২২, ৮ঃ১১

ই- ৩ সালাত প্রস্তুতি

প্রশ্ন- (১) ইসলামে নামাজের ভূমিকা ও গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (২) পূর্ববর্তী নবীর উম্মতদের জন্যও কি নামাজ ফরজ ছিল?
প্রশ্ন- (৩) অযু ছাড়া নামাজের আর কোন পূর্বশর্ত আছে কি?
প্রশ্ন- (৪) যে কোন স্থানেই কি নামাজ পড়া যায়? নাকি সুনির্দিষ্ট জায়াগায় নামাজ পড়তে হবে?
প্রশ্ন- (৫) কোনদিকে ফিরে নামাজ পড়তে হবে?
প্রশ্ন- (৬) কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ার গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৭) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচী কি?
প্রশ্ন- (৮) যথাসময়েই নামাজ পড়া কি আবশ্যক?
প্রশ্ন- (৯) নামাজের জন্য ইসলামে কিভাবে আহবান করা হয়?

উত্তরঃ (১) নামাজের ভূমিকা ও গুরুত্ব-

নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এটা মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কুরআনে অনেক স্থানে নামাজের তাগিদ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় নামাজের তাগিদের সাথে যাকাতেরও উল্লেখ এসেছে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন নামাজ মুসলমান আর অমুসলমানের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। নামাজকে অস্বীকার করা কুফরী। হাশরের ময়দানে নামাজের কথা সবার আগে জিজ্ঞেস করা হবে। যারা আন্তরিকভাবে নামাজ আদায় করে তাদের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

উত্তরঃ (২) পূর্ববর্তী নবীর উম্মতদের উপরও কি নামাজ ফরজ ছিল?

কুরআনে এ ব্যাপারে উদ্ধৃতি আছে যে পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষাতেও নামাজের উল্লেখ ছিল। তবে সে নামাজের ধরণ ও প্রকৃতি কি ছিল তা জানা যায় না। সূত্রের আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), শুয়াইব (আঃ), ঈসা (আঃ)কে নামাজের কথা বলছেন। এই নামাজই রাসুল (সাঃ)-এর মিশনের মাধ্যমে পূর্ণভাবে কায়েম হয়েছে।

উত্তরঃ (৩) নামাজের প্রস্তুতি ও পূর্বশর্ত-

(ক) মানুষ যখন কোন কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যায় তখন ভাল পোষাক পড়ে। ঠিক তেমনি নামাজের আগে মুসলমানদের শরীয়ত সম্মত মার্জিত পোষাক পড়তে হবে। মেয়েদের জন্য তাদের মুখ ও হাত বাদে পুরো শরীর ঢিলেঢালা পরিস্কার পোষাকে আবৃত করতে হবে। ছেলেদের অন্ততঃ নাভির উপর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত আবৃত করতে হবে।
(খ) পোষাক পবিত্র পরিস্কার হতে হবে।
(গ) নামাজের জায়গা পরিস্কার হতে হবে।

উত্তরঃ (৪) নামাজের দিক-

জুমা ও জামাতে নামাজ ছাড়া নামাজের জন্য মসজিদ বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে যাবার প্রয়োজন নেই। যে কোন পরিস্কার স্থানেই নামাজ পড়া যাবে। রাসুল (সাঃ) বলেন সমগ্র পৃথিবীই মসজিদ

(সেজদার যোগ্য) হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। ভ্রমণকারী মানুষ যানবাহনে বসে এমনকি ইশারাতেও নামাজ পড়তে পারবে। জামায়াতে নামাজ পড়া উত্তম তবে এটা পূর্বশর্ত নয়।

উত্তরঃ (৫) নামাজের দিক-

পশ্চিমা বিশ্বে এটা একটা ধারণা যে মুসলমানরা পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বের মুসলমান কেবলামুখী (কাবা, মক্কা) হয়ে নামাজ পড়ে। সেজন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কেবলার সাপেক্ষে নামাজের দিক বিভিন্ন। চলমান যানবাহন থেকে যদি সার্বিকভাবে দিক নির্ণয় করা না যায় তবে যানের গতির দিকে ফিরে নামাজ আদায় করলে চলবে।

উত্তরঃ (৬) কেবলামুখী হবার গুরুত্ব-

কাবা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য নির্মিত প্রথম ঘর, যা ইব্রাহীম (আঃ) নির্মাণ করেন। এটা তাই একত্ববাদের এবং সব নবীর ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসের প্রতীক। ইসলামের বিজয়ের পূর্বে পৌত্তলিকরা কাবা ঘরে মূর্তিপূজা করত। সেজন্যে প্রথমদিকে মুসলমানরা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ত।

মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘর থেকে মূর্তি অপসারণ ও ধ্বংস করা হয়। তারপর থেকে আজ দেড়হাজার বছর সারা পৃথিবীর তাওহীদবাদীরা কাবামুখী হয়ে নামাজ পড়ছে।

উত্তরঃ (৭) নামাজের সময়-

নামাজের পাঁচ ওয়াক্ত নিম্নরূপ–

- ফজর- সূর্যোদয়ের ৭০ থেকে ৯০ মিনিট পূর্বে থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত।
- যোহর- সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের অর্ধেকের পর থেকে এই নামাজের সময় শুরু।
- আসর- মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের অর্ধেকের পর থেকে এই নামাজের সময় শুরু।
- মাগরিব- সূর্যাস্তের পর পর।
- এশা- সূর্যাস্তের এক থেকে দেড় ঘন্টা পর শুরু হয়।

উত্তরঃ (৮) যথা সময়ে নামাজের প্রয়োজনীয়তা-

নামাজ যথাসময়ে পড়া উচিত; অবশ্য এক ওয়াক্তের যে কোন সময়েই নামাজ পড়া যাবে।
ঠিক সূর্যোদয়ের সময় এবং ঠিক মধ্যাহ্নে এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়া যাবে না।

উত্তরঃ (৯) নামাজের আহবান- আযান-

ইসলামে নামাজের আহবান হচ্ছে আযান। যা লক্ষ লক্ষ মসজিদের মিনার থেকে দেড় হাজার বছর ধরে দিনে পাঁচবার ধ্বনিত হচ্ছে। এই অনুপম আহবানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশ পায়।

আযানের অর্থ–

আল্লাহ মহান (৪ বার)

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই (২ বার)

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল (২ বার)

নামাজের জন্যে এসো (২ বার)
কল্যাণের জন্যে এসো (২ বার)
আল্লাহ মহান (২ বার)
আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই (একবার)

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৮৭ঃ১৪-১৫
প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ১৪ঃ৪০, ২১ঃ৭২-৭৩, ১৯ঃ৫৪-৫৫, ২০ঃ১৪, ১৯ঃ৩০-৩১, ৩ঃ৪৩, ১১ঃ৮৭, ৩১ঃ১৭, ১৭ঃ৭৮-৭৯, ৭৩ঃ১-৪

ই- ৪ সালাত- পদ্ধতি ও গুরুত্ব

প্রশ্ন- (১) নামাজ কিভাবে পড়তে হয়?

প্রশ্ন- (২) নামাজে কত রাকাত পড়তে হয়?

প্রশ্ন- (৩) নামাজের শুরুতে হাত উঠিয়ে 'তাকবীরে তাহরিমা' বলতে হয় কেন?

প্রশ্ন- (৪) কোন সুরাটি প্রত্যেক রাকাতে পড়তে হয়?

প্রশ্ন- (৫) মুসলমানরা 'ফাতিহা' পড়ার সময় কি এটা অনুভব করে যে আল্লাহ্ তাদের কথা শুনছেন?

প্রশ্ন- (৬) 'ফাতিহা' ছাড়া কুরআনের আর কোন সুরা অথবা আয়াত কি নামাজে পড়তে হয়?

প্রশ্ন- (৭) নামাজে উঠাবসা করতে হয় কেন?

উত্তরঃ (১) নামাজ যেভাবে পড়তে হয়-

নামাজ কয়েকটি রাকাতের সমন্বয়ে গঠিত। নামাজ শুরুর আগে নিয়ত করে দু'হাত কানের লতি পর্যন্ত তুলে আল্লাহু আকবর বলে হাত বাঁধতে হয়। ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতে হয়। দাঁড়ানো অবস্থায় কমপক্ষে যা পড়তে হয় তা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা'। নামাজ চলাকালে যা করা যাবে না তা হচ্ছে–

(ক) এদিক সেদিক তাকানো যা নামাজ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়।

(খ) অন্যদের সাথে কথা বলা।

(গ) কোন কিছু খাওয়া বা পান করা।

নামাজে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ নামাজ। চোখ খোলা রেখে সেজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। অবশ্য কেউ কেউ চোখ বন্ধ করলে বেশী মনোযোগ বোধ করেন। দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত শেষে নামাজী আবারো আল্লাহু আকবার বলে রুকু করবে। (হাঁটু পর্যন্ত সামনে ঝুঁকবে) রুকু করার সময় পিঠ থাকবে সোজা, মাথা থাকবে হাঁটুর সমান্তরালে। এ অবস্থায় একটি দোয়া (তাসবিহ) পড়তে হবে। অতঃপর সে 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদা' (আল্লাহ তার প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেন) বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় উচ্চারণ করবে 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ'। (হে আমাদের প্রভূ সমস্ত প্রশংসা আপনারই)। এরপরই আছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ সেজদা। আল্লাহু আকবার বলে নাক ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে সেজদা দিতে হবে। সেজদায় একটি দোয়া (তাসবিহ) পড়তে হবে। দুটো সেজদার মাঝখানে আল্লাহু আকবার বলে বসতে হবে। এইভাবে নামাজের প্রথম রাকাত শেষ হবে।

উত্তরঃ (২) নামাজের রাকাত সংখ্যা-

ওয়াক্ত ভেদে নামাজের রাকাত সংখ্যা দুই থেকে চার। ফজর নামাজে দুই রাকাত ফরজ নামাজ আছে। যোহরে চার রাকাত, আসরে চার রাকাত, মাগরীবে তিন রাকাত, এশায় চার রাকাত ফরজ নামাজ আছে। এছাড়াও প্রতি ওয়াক্ত নামাজে কিছু সুন্নাত নামাজও পড়া হয়।

উত্তরঃ (৩) নামাজের শুরুতে হাত উঠাবার গুরুত্ব-

হাত হচ্ছে শক্তির প্রতীক। দুই হাত উপরে উঠিয়ে নামাজের শুরুতে মুসলমানরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। যথা–

(ক) হাত তোলার মাধ্যমে সে আল্লাহর প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

(খ) হাত উপরে উঠিয়ে অতঃপর নিয়ত বাঁধার পর সে সমগ্র দুনিয়াকে পশ্চাতে ফেলে আল্লাহমুখী হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। এভাবে আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

উত্তরঃ (৪) প্রত্যেক রাকাতে যে সূরা পড়তে হয়-

প্রত্যেক রাকাতে কমপক্ষে কুরআনের প্রথম সূরা 'ফাতিহা' তেলাওয়াত করতে হয়। এ সূরার অর্থ হচ্ছে–

দয়াময় অনন্ত দাতা আল্লাহর নামে।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,
যিনি জগৎ সমূহের মালিক,
যিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল, শেষ বিচার দিনের মালিক।
আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।
আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন।
যে পথ আপনার প্রিয়জনের পথ।
সে পথে নয়, যে পথ আপনার অভিশাপগ্রস্ত।

উত্তরঃ (৫) আল্লাহ কি নামাজীর দোয়া শুনতে পান-

সূত্রে একটি হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় আল্লাহ নামাজীর দোয়া শুনেন। বিশেষভাবে যখন 'সুরা ফাতিহা' পড়া হয় তখন আল্লাহ তার জবাব দেন। নামাজ মুমিনের জন্য আল্লাহর দর্শন বা মিরাজ।

উত্তরঃ (৬) নামাজে পঠিতব্য অন্য সূরা বা আয়াত প্রসঙ্গে-

অত্যাবশ্যকীয় 'সূরা ফাতিহা' ছাড়াও নামাজে যা যা পড়া হয়–

(ক) সানা, যা 'সুরা ফাতিহা' পড়ার আগে রাসুল (সাঃ) সাধারণত পড়তেন।

(খ) সূরা ফাতিহার পর কুরআনের কিছু অংশ যেমন একটি ক্ষুদ্র সুরা বা বড় সূরার কয়েকটি আয়াত পড়তে হয়। পঠিতব্য সুরা বা আয়াতসমূহের দৈর্ঘ্য নামাজীর জ্ঞান ও সময়ের উপর নির্ভর করে ছোট-বড় হতে পারে।

উত্তরঃ (৭) নামাজে বার বার উঠা-বসা প্রসঙ্গে-

নামাজে উঠা-বসার বিশেষ গুরুত্ব রয়ে গেছে। মানুষ বস্তু, বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে গড়া। মানুষের এই তিন উপাদানের অপূর্ব সম্মিলনের মাধ্যমে নামাজে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ ঘটে।

এভাবে নামাজে সে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে এবং তার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই নয় বরং দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতাও বটে। নামাজে পঠিত কুরআনের আয়াতসমুহের শিক্ষা অনুধাবনের জন্য নামাজীর মন উন্মুক্ত থাকে এরই সাথে আল্লাহর নির্দেশনায় শরীরের উঠানামার সমন্বয় এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের সেজদা মানুষকে আল্লাহর সমীপে উপনীত করে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

আন্নবী সঙ্কলিত হাদীসে কুদসীর ৮ নং হাদীস।

ই- ৫ নামাজ- পদ্ধতি ও গুরুত্ব (চলমান)

প্রশ্ন- (১) নামাজের বিভিন্ন আসনে কি কি দোয়া পড়তে হয়?
প্রশ্ন- (২) নামাজ কি আরবীতে পড়াই আবশ্যক?
প্রশ্ন- (৩) নামাজ শেষ করার কোন বিশেষ পদ্ধতি আছে কি?
প্রশ্ন- (৪) নামাজের ওয়াক্তের কোন গুরুত্ব আছে কি?
প্রশ্ন- (৫) যদি কেউ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সময়মত নামাজ না পড়তে পারে তবে তার কি করণীয়?
প্রশ্ন- (৬) কোন বিশেষ অবস্থায় কাউকে নামাজ থেকে বিরত থাকতে ইসলাম আদেশ করে কি?
প্রশ্ন- (৭) কেউ যদি পাঁচ বারের বেশী নামাজ পড়তে চায় তবে সে কি তা করতে পারবে?

উত্তরঃ (১) নামাজে পঠিত দোয়াসমূহ-

দাঁড়ানো অবস্থায় 'সূরা ফাতিহা' এবং কুরআনের আর একটু তেলাওয়াত করে মুসলমানরা রুকুতে যায়। এ সময় কোমরের উপর থেকে শরীর সামনে ৯০ ডিগ্রী ঝুঁকিয়ে দু হাত হাঁটুতে রেখে পড়তে হয়, "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" (আমার সম্মানিত প্রভুর প্রশংসা) এটা অন্ততঃ তিনবার পড়তে হয়। সেজদার সময় যখন মুসলমানরা আল্লাহর কাছে পূর্ণনতি প্রকাশ করে তখন পড়া হয় "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা " (আমার শ্রেষ্ঠ প্রভুর প্রশংসা), এটাও অন্ততঃ তিনবার পড়া হয়। দুই সেজদার মাঝখানে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে পড়তে হয় "আল্লাহু মাগফিরনী ওয়ারহামনি" (হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন ও দয়া করুন)।

উত্তরঃ (২) নামাজ কি আরবীতে পড়া আবশ্যক-

নামাজে ব্যবহৃত সুরা ও দোয়াসমূহ মনে রাখা বেশ সহজ, কারণ এগুলো বেশ ছোট ছোট আর প্রতিদিন অনেকবার পড়তে হয়। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে দেড় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সবখানে জাতি, ভাষা নির্বিশেষে সব যুগের মুসলমান একই ভাষায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ছে। কুরআন এবং নামাজের ভাষার এই ঐতিহ্য সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে ঐক্য এনেছে। এ বিষয়ে সব বিশেষজ্ঞ একমত যে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে। আর কোন ভাষায় এর পুরো সফল অনুবাদ করা যায় না। তাই নামাজ আরবীতেই পড়তে হবে।

উত্তরঃ (৩) নামাজ শেষ করার পদ্ধতি-

নামাজের নির্ধারিত রাকাত শেষে বসতে হবে এবং 'তাশাহুদ' পড়তে হবে। (অবশ্য প্রতি দুই রাকাত পড়েই এই বৈঠক করতে হয়)। 'তাশাহুদ'-এর অর্থ "আমার মৌখিক দৈহিক আর্থিক সব ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত। হে নবী আপনাকে সালাম। আপনার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আমাদের এবং আর সব আল্লাহর ইবাদাতকারীদের উপর

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল।"

এই তাশাহুদ পড়বার পরে দরুদ পড়তে হয়। দরুদ হচ্ছে রাসুল (সাঃ)-এর জন্য প্রশংসা ও দোয়া। এর অর্থ, "হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারিদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। যেমন শান্তি আপনি ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর অনুসারিদের দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান। হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারিদের বরকত দান করুন যেমন বরকত আপনি ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর অনুসারিদের দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান"।

এরপর নামাজী প্রথমে ডানে পরে বামে মাথা ঘুরিয়ে প্রতিবারে বলবে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ (আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। এভাবে নামাজ শেষ হবে।

উত্তরঃ (৪) নামাজের ওয়াক্তের গুরুত্ব-

নামাজের ওয়াক্তগুলো এমনভাবে করা হয়েছে যাতে বিশ্বাসীদের মনে সব সময় আল্লাহর স্মরণ থাকে। এটা তাকে আল্লাহর দেয়া খেলাফতের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে সারাদিন আল্লাহর স্মরণে মন সচেতন থাকে। ফজর নামাজ পড়ে মানুষ আল্লাহর নাম নিয়ে দিন শুরু করে। যোহর এবং আসর এমন সময়ে পড়া হয় যখন মানুষ দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। এই ব্যস্ততার মাঝেও একটু বিরতিতে আল্লাহর স্মরণ তাকে মনে করিয়ে দেয় সে কার বান্দা, কি তার দায়িত্ব। মাগরিবের সময় সাধারণতঃ তার দিনের কাজ শেষ হয়। সে পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হয়। এ সময় সে আর একটি দিন অতিবাহিত হবার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে পারে। এশার নামাজে আল্লাহকে স্মরণ করে সেই স্মরণ মনে রেখেই সে ঘুমাতে যায়।

উত্তরঃ (৫) ফরজ নামাজ বাদ পড়লে (কাযা হলে)-

সকল ফরজ নামাজ যথাসময়ে বা অন্ততঃ ওয়াক্ত থাকতেই আদায় করতে হবে। এটাই আইন। অবহেলায় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে নামাজ আদায়ে দেরী করা ঠিক না। কারণ এতে একজনের আল্লাহর কাজে উৎসাহের অভাবই প্রকাশ পায়। তারপরও অত্যন্ত জরুরী যৌক্তিক কারণে নামাজ বাদ পড়লে তা পরে যথাশীঘ্র কাযা পড়তে হবে। এ ধরনের সঙ্গত কারণ; যথা- অতি ক্লান্ত ব্যক্তি যিনি নামাজের সময় ঘুম থেকে উঠতে ব্যর্থ হলেন, সার্জন যার জরুরী অপারেশন চলাকালে নামাজের ওয়াক্ত চলে গেল ইত্যাদি।

উত্তরঃ (৬) যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে নামাজ থেকে বিরত রাখে বা অব্যাহতি দেয়-

বালেগ হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। শিশু ও মানসিক প্রতিবন্ধীরা এই আইনের আওতামুক্ত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মানুষকে নামাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

(ক) মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব এবং সন্তান জন্মের পর নেফাস (Lochia) অবস্থায়। এ সময় তাদের নামাজ পড়া বারণ। অন্যান্য দোয়া তারা করতে পারবে।

(খ) অসুস্থ মানুষ যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারে তবে সে বসে বা শুয়ে নামাজ পড়তে পারবে।

(গ) ভ্রমণকারী ব্যক্তিরা চার রাকাত নামাজের বদলে দুই রাকাত করে নামাজ পড়তে পারবে। এক্ষেত্রে তারা যোহর নামাজের সাথে আসর নামাজকে এবং মাগরিব নামাজের সাথে এশার নামাজকে যুক্ত করে একসাথে পড়তে পারবে।

(ঘ) বিপদজনক পরিস্থিতিতেও (যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে) নামাজ পড়তে হবে তবে সেখানে তার ধরণ পরিবর্তিত হতে পারে।

উত্তরঃ (৭) অতিরিক্ত নামাজ-

তিন ধরনের নামাজ আছে। যথা- ফরজ যা অবশ্যই পড়তে হবে। সুন্নাত যা পড়তে গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন ফজরের নামাজের আগে দুই রাকাত ইত্যাদি। এছাড়া নফল নামাজ মানুষ যে কোন সময় পড়তে পারে। মুসলামনরা যত বেশী সম্ভব নফল নামাজ আদায় করবে। সূর্যোদয়ের সময় এবং ঠিক দুপুরের সময় যখন সূর্য মাথার উপর থাকে এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়া নিষেধ।

ই- ৬ জুম্মা ও জামায়াতে নামাজ

প্রশ্ন- (১) এমন কোন নামাজ আছে কি যা জামায়াতেই পড়তে হবে।
প্রশ্ন- (২) জামায়াতে নামাজ পড়ার নিয়ম কি?
প্রশ্ন- (৩) মেয়েরা কি নামাজের জামায়াতে আসতে পারবে?
প্রশ্ন- (৪) নামাজের জামায়াতে মেয়েরা কোথায় দাঁড়াবে?
প্রশ্ন- (৫) নামাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব কি?
প্রশ্ন- (৬) নামাজ মানুষের নৈতিক উন্নতি ঘটায় কিভাবে?
প্রশ্ন- (৭) সমাজ জীবনের উপর নামাজের প্রভাব কি?

উত্তরঃ (১) যে সব নামাজ অবশ্যই জামায়াতের সাথে পড়তে হবে-

নিম্নলিখিত নামাজগুলো অবশ্যই জামায়াতে পড়তে হবে।

(ক) জুম্মার নামাজ প্রতি শুক্রবার দুপুরে পড়া হয়। এখানে ইসলাম ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োগের উপর খোৎবা দেয়া হয়।

(খ) মৃতের জানাজা নামাজ।

(গ) দুই ঈদের নামাজ।

এছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে পড়তে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে এতে ২৭ গুণ সওয়াব পাওয়া যাবে। জামায়াতে নামাজ যদিও মসজিদে পড়া হয় তবে প্রয়োজনে এক বাড়ীর কয়েকজন বা প্রতিবেশী কয়েক বাড়ীর সবাই একঘরে জামায়াতের সাথে নামাজ পড়তে পারে।

উত্তরঃ (২) জামায়াতে নামাজের পদ্ধতি-

জামায়াতে নামাজের পদ্ধতি এককভাবে নামাজের মতই। এখানে নামাজিদের পায়ে-পা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াতে হয়। নামাজিদের সামনে তাদের ইমাম (যিনি কোন যাজক নন, যে কেউ ইমাম হতে পারে) দাঁড়িয়ে নামাজে নেতৃত্ব দেন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করলে জনগণ নিয়ত বাঁধে। তারপর প্রতি অবস্থানে পরিবর্তনের সময় তিনি আল্লাহু আকবার বলেন। সবশেষে তিনি ডানেবামে সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করেন। জামায়াতে নামাজে ইমামের আনুগত্য করতে হয় ফলে কেউ নামাজের কোন কাজ ইমামের আগে করতে পারেনা বরং তাকে অনুসরণ করে।

উত্তরঃ (৩) মেয়েদের জামায়াতে নামাজের সুযোগ-

মেয়েরা নামাজের জামায়াতে যোগ দিতে পারে। ঘরে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে বা মসজিদে ময়দানে সবখানেই মেয়েরা জামায়াতে যেতে পারে। রাসুল (সাঃ) এক হাদীসে মেয়েদের জামায়াতে নামাজ থেকে বঞ্চিত রাখতে মুসলমানদের নিষেধ করেছেন। তাঁর সময়ে এবং তাঁর প্রিয় খলিফার সময় মেয়েরা মসজিদে নামাজে যেত। তবে জুম্মা, জানাজা ও ঈদের নামাজ মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তারা ইচ্ছে করলেই যেতে পারে, না গেলেও কোন অসুবিধে নেই। এটা মেয়েদের জন্যে আল্লাহর ছাড়।

উত্তরঃ (৪) নামাজের জামায়াতে মেয়েদের অবস্থান-

নামাজ একটি বিস্তৃত এবাদাত। এতে উঠা-বসা, উপুড় হয়ে সেজদা দেয়াসহ অনেক শারীরিক কাজ আছে। এজন্যে নামাজের জামায়াতে মেয়েদের পুরুষের পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে হয়। মেয়েরা পুরুষের সামনে বা এক কাতারে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালে নারী-পুরুষ উভয়ের নামাজের মনোযোগ ক্ষুন্ন হত।

উত্তরঃ (৫) নামাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব-

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে নামাজের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

প্রথমতঃ সব মানুষেরই তার চাইতে শক্তিশালী সত্তার বন্দনা করার সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। তাই দেখা যায় যেসব মানুষ দ্বীনের শিক্ষা পায়না তারা প্রকৃতি, আগুন, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাধু ব্যক্তি এদের পূজা করে। এসব কিছুই মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। নামাজ এমন এক এবাদাত যা সর্বোচ্চ স্রষ্টার সাথে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে তার সহজাত আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে।

দ্বিতীয়তঃ নামাজ আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালবাসার বাস্তব প্রয়োগ। দিনে পাঁচবার নামাজে দাঁড়ানো এবং এই অনুভূতি লাভ যে আল্লাহ বান্দার কথা শুনছে- তা বান্দার মনে এক অনির্বচনীয় সুন্দর প্রভাব ফেলে।

তৃতীয়তঃ যখন মানুষ নামাজে দাঁড়ায় তখন সে পৃথিবীর উপর দাঁড়ায়। এই পৃথিবীর মাটি থেকেই সে সৃষ্ট। মৃত্যুর পর এর মাঝেই সে মিশে যাবে। আবার হাশরের ময়দানে এই মাটির উপরই দাঁড়াবে। এই মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সে তার স্রষ্টার প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রকাশ করে।

চতুর্থতঃ নামাজ মানুষকে বার বার তার উপর আল্লাহর অগণিত রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই আল্লাহর প্রশংসা তার অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি এনে দেয়।

সবশেষে যারা নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়ে তাদের অন্তরে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির অনুভূতি আসে। আল্লাহ-প্রাপ্তির অনুভব তাদের অসীম সাহস যোগায়।

উত্তরঃ (৬) মানুষের নৈতিক উন্নয়নের নামাজ-

আন্তরিকভাবে যে নামাজ পড়ে সে লক্ষ্য করবে যে, নামাজ তার জীবনকে পরিশুদ্ধ করছে। দিনে পাঁচবার সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করে। এভাবে তার মধ্যে আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি কোন অনৈতিক কাজ সম্পর্কে ভীতির জন্ম নেবে। হাদীসে আছে যে, যার নামাজ তাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না, সে নামাজ থেকে কিছুই পায় না। মানুষ কোন ভুল বা অন্যায় করে ফেললে নামাজ তাকে তার দায়মুক্ত হতে সাহায্য করে। হাদীসে আছে, নামাজের জন্য অজু করার সময় অযুর পানি পাপ ধুয়ে নেয়।ইসলামে ধর্মীয় জীবন ও নৈতিক জীবন পৃথক নয় বরং নৈতিক জীবন ধর্মীয় জীবনেরই অংশ। এভাবে নামাজ ব্যক্তিজীবনে নৈতিক উন্নতি ঘটায়।

উত্তরঃ (৭) সমাজ জীবনে নামাজের প্রভাব-

নামাজ সমাজ জীবনকে পরিশুদ্ধ করে চারভাবে–

(ক) জামায়াতে নামাজ ভ্রাতৃত্বের ও ঐক্যের অনুপম বহিঃপ্রকাশ। মসজিদে সমাজের কারো জন্য সংরক্ষিত আসন নেই। সবাই এক কাতারে দাঁড়ায়। ছোট বড় সবার মাঝে নামাজ এভাবে সাম্য আনে।

(খ) সমাজের মানুষের নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ ও মিলন হয় জামায়াতে। এভাবে সমাজে সংহতি পারস্পরিক ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

(গ) ইমামকে অনুসরণের শৃঙ্খলা থেকে মানুষের মাঝে আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়।

(ঘ) জামায়াতে নামাজ ইসলামী সরকার ব্যবস্থার সদৃশ, কারণ–

(১) নামাজের ইমাম দেশের শাসক বা যে কেউ হতে পারেন। যাকে সমাজ মনোনীত করবে এবং যার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকবে না।

(২) ইমামরা যাজকদের মতো আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝের কেউ নন নামাজের পরিচালক মাত্র। তেমনি শাসকরাও দেশের পরিচালক মাত্র। মানুষের উপর তাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রভূত্ব নেই।

(৩) ইমাম ভুল করলে মুসল্লীরা আল্লাহু আকবার বলে ভুল ধরিয়ে দেন। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক ভুল করলে তার ভুল ধরিয়ে দেয়া জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব।

(৪) ইমাম যদি ভুল করেই যেতে থাকে বা ভুল সংশোধনে অস্বীকৃতি জানায় তবে মুসল্লীরা তাকে অপসারণ করতে পারে। তেমনি রাষ্ট্রের শাসকও যদি ভুল সংশোধন করতে না চায় তবে জনগণ তাকে পদচ্যুত করতে পারে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ২০ঃ১৪, ২ঃ১৫৩, ১৩ঃ২৮

উত্তর ঃ (৫) আল কুরআন ২৯ঃ৪৫

হাদীসে কুদসীতে আছে যে রাসুল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ শুধু তাদের দোয়া কবুল করেন যারা তাঁর মর্যাদার কাছে মাথা নত করে, যারা তাদের লোভকে সংবরণ করে, আল্লাহ নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখে, ক্ষুধার্তকে খাওয়ায় এবং বস্ত্রহীনকে কাপড় দেয়।

ই- ৭ তৃতীয় স্তম্ভ- যাকাত

প্রশ্ন- (১) যাকাতের অর্থ কি? ইংরেজী বা অন্য ভাষায় এর সমতূল্য কোন শব্দ আছে কি?
প্রশ্ন- (২) ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (৩) যাকাত কিভাবে পরিশুদ্ধি আনে?
প্রশ্ন- (৪) সম্পত্তির মালিকানা প্রশ্নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কি?
প্রশ্ন- (৫) কাদের উপর যাকাত ফরজ?
প্রশ্ন- (৬) বাড়ীর সব সম্পদের উপরই কি যাকাত আদায় করতে হবে?
প্রশ্ন- (৭) যাকাতের পরিমাপ কিভাবে করা হবে?
প্রশ্ন- (৮) যাকাত আদায়ের কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি?
প্রশ্ন- (৯) যাকাতের টাকার দাবীদার কারা?

উত্তরঃ (১) যাকাতের অর্থ-

যাকাত শব্দের মূল অর্থ পরিশুদ্ধি বা বিশুদ্ধতা। এছাড়াও এর অর্থ বৃদ্ধি বা উন্নতি। এভাবে বলা যায় যে যাকাত দেয়ার মাধ্যমে মানুষের পরিশুদ্ধতার বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। আইনের ভাষায় আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্য লোককে দেয়ার নাম যাকাত। ইংরেজী শব্দ Tithe-এর সাথে যাকাতের তুলনা হয় না। কারণ Tithe-এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গীর্জায় জমা হয় আর যাকাতের অর্থ সম্পূর্ণভাবে দরিদ্র মানুষের ভাগে যায়। ট্যাক্স শব্দও যাকাতের প্রতিশব্দ হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্র এটা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। আর জনগণ সব সময় এটা ফাঁকি দিতে চায়। অথচ যাকাত দেবার ব্যাপারে মুসলমানরা সচেতন থাকে। দান-দক্ষিণা এই শব্দগুলো যাকাতের কাছাকাছি। কিন্তু যাকাত মানে দান নয় বরং এটা ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার। বস্তুতঃ যাকাত শব্দটির অনুবাদ না করে এটিকে ধর্মীয় শব্দ হিসেবেই সংরক্ষণ করা উচিত।

উত্তরঃ (২) ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব-

কুরআনে ৮০ টিরও বেশী আয়াতে নামাজের সাথে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় ইসলামে এর গুরুত্ব কত বেশী। কুরআনে বারবার যাকাত দাতাদের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যারা যাকাত দেয় না তাদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

উত্তরঃ (৩) যাকাত যেভাবে পরিশুদ্ধি আনে-

যাকাত শুধু গরীবদের পাওনাই মিটায় না এটা পরিশুদ্ধিও আনে। যেমন–

(ক) ধনীরা তাদের সম্পদের থেকে গরীবদের অংশ দিয়ে পুরো সম্পদকে বিশুদ্ধ করে।
(খ) যারা যাকাত দেয় তাদের অন্তর স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সমাজ-অসচেনতা ও দুনিয়া-প্রীতি থেকে পরিশুদ্ধ হয়।
(গ) যাকাত গ্রহীতার অন্তর ধনীদের প্রতিহিংসা ও ঘৃণা থেকে মুক্ত হয়।

(ঘ) সমাজ বহুলাংশে পরিশুদ্ধ হয়। কারণ যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্রতা, সামাজিক অবিচার, শ্রেণী-বৈষম্য ইত্যাদি দূর হয়। যদি ধনীরা আরও ধনী আর গরীবরা আরও গরীব হতে থাকে তবে সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এমন সমাজে বিশৃঙ্খলা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা মাথাচারা দিয়ে উঠে।

উত্তরঃ (৪) সম্পত্তির মালিকানা প্রশ্নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী-

ইসলামে এটা স্পষ্ট যে জগতের সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি বিশ্বজাহানের প্রভূ। তাই কেউই তাঁর সম্পদের মালিক নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষক বা আমানতদার মাত্র। আল্লাহ্ তাঁর অপার দয়ায় মানুষকে সম্পদ দেন। কিন্তু এই সম্পদ হচ্ছে এক পরীক্ষা। মানুষকে যোগ্যতা ও পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ সম্পদ দেবেন। আবার মানুষ সেই সম্পদ থেকে আল্লাহ্র আদেশে দরিদ্রদের প্রাপ্য অংশ দেবে। যারা এটা করবে তারা পুরস্কৃত হবে। আর যারা সম্পদের মোহে আল্লাহ্র আদেশ ভুলে যাবে তারা আল্লাহ্র আমানতের খেয়ানত করবে।

উত্তরঃ (৫) কাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরজ-

পরিবারের সারা বছরের ভরণ-পোষণ নির্বাহের পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকে তার উপর যাকাত ফরজ। এই নিসাব হচ্ছে ৭$\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণ বা ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রুপা বা সমপরিমাণ টাকা। নিসাব পরিমাণ অর্থ হাতে এক বছর বা তার বেশী সময় থাকতে হবে।

উত্তরঃ (৬) সব সম্পদের উপরই কি যাকাত ফরজ-

জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের বস্তুসমূহ যথা পোষাক, খাদ্য, আসবাব, বাড়ী-ঘর ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। ভূমিতে উৎপন্ন শস্য, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির উপর যাকাত ফরজ।

উত্তরঃ (৭) যাকাতের পরিমাণ-

সম্পদের উপর যাকাতের পরিমাণ ২.৫% থেকে সম্পদ ভেদে ২০% পর্যন্ত হতে পারে। সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কারের স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির উপর যাকাত ২.৫%। যে জমিতে বিনা সেচে বা হস্তচালিত সেচে চাষাবাদ হয় তার ফসলের যাকাত ১০%। আর যে জমিতে যান্ত্রিকভাবে সেচ দিয়ে চাষ করতে হয় তার ফসলের যাকাত ৫%। গুপ্তধন এবং খনির সম্পদের যাকাত ২০%।

উত্তরঃ (৮) যাকাত প্রদানের সময়-

যাকাত প্রতি বছর দিতে হবে। তবে গুপ্তধন ও খনির সম্পদের যাকাত সাথে সাথে দিতে হবে। জমির শস্যের ক্ষেত্রে ফসল কাটার পর যাকাত দিতে হবে। রমজান মাসে যাকাত দেয়া উত্তম। কারণ এটা রহমতের মাস। এ মাসে সব এবাদাতের সওয়াব বেশী। যাকাত কিস্তিতেও দেয়া যাবে।

উত্তরঃ (৯) যাকাত প্রাপ্য কারা-

নবম সুরার ৬০নং আয়াতে যাকাত প্রদেয় আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে। তারা হচ্ছে দরিদ্র, গরীব যারা চাইতে লজ্জা পায়, যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মচারী, নওমুসলিম, মুক্তিমূল্য সংগ্রহকারী ক্রীতদাস, যুদ্ধবন্দী, প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। এছাড়া আল্লাহর পথে জেহাদেও যাকাত ব্যয় করা যাবে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৯ঃ১০৩

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ২৪ঃ৫৬, ৯ঃ৩৪, ২ঃ২৬১, ৫১ঃ১৫-১৯

প্রশ্ন- (৪) আল কুরআন ৫৭ঃ৭, ২ঃ২৬২, ২ঃ১৮৮, ২ঃ২৪৫

প্রশ্ন- (৫) আল কুরআন ৯ঃ৬০

ই- ৮ চতুর্থ স্তম্ভ– সিয়াম (রোজা)

প্রশ্ন- (১) রমজান মাস এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন?

প্রশ্ন- (২) রমজান মাসে মুসলমানরা কি কি কাজ করতে পারে এবং কি কি কাজ করতে পারে না?

প্রশ্ন- (৩) রমজান মাস বিভিন্ন বছর বিভিন্ন সময়ে আসে কেন?

প্রশ্ন- (৪) স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা মেরু অঞ্চলে বছরে মাসের পর মাস দিন বা রাত থাকে। সেখানে লোকজন কোন সময়সূচী অনুসারে রোজা রাখবে?

প্রশ্ন- (৫) রোজা কি শিশু এবং বৃদ্ধদেরও রাখতে হয়?

প্রশ্ন- (৬) কোন কোন অবস্থায় রোজা মাফ করা হয়েছে?

প্রশ্ন- (৭) অনেক অমুসলিম মুসলমানদের সারাদিন না খেয়ে থাকা দেখে ভীত হয়। তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন?

প্রশ্ন- (৮) রোজার মাসে কি মুসলিম দেশে কাজ-কর্ম ব্যবসা বাণিজ্যে ভাটা পড়ে?

প্রশ্ন- (৯) মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে রোজার গুরুত্ব কি?

প্রশ্ন- (১০) রোজার মাস শেষে কি হয়?

উত্তরঃ (১) রমজানের গুরুত্ব-

(ক) **ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ** রমজান মাস ইসলামী ক্যালেন্ডারের নবম মাস। এ মাসেই রাসুল (সাঃ)-এর উপর হেরা গুহায় প্রথম কুরআন নাজিল হয়েছিল। এর গুরুত্ব শুধু মুসলমানদের জন্যই না। বরং গোটা ইতিহাসে সব নবীর উম্মতের উপরই এ মাসে রোজা ফরজ ছিল। কারণ এ মাসেই আল্লাহ মানব জাতির সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ জীবন বিধান কুরআন প্রণয়ন করেন। যা অনেক নবীর মিশন শেষে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মানব জাতিকে দেয়া হয়। কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্য সূচনাকারী আলফুরক্বান।

(খ) **আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুরুত্ব ঃ** ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহ সব মানুষের অতি নিকটের বিশেষভাবে যারা আল্লাহর আদেশপালন করে এবং তার আলোকেই জীবনকে পুনর্বিন্যস্ত করে। রমজানে আল্লাহর হুকুমে রোজা পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালন করে তাঁর নৈকট্য হাসিল করা যায়। তাই বিশ্বাসীদের জন্য এ মাস অত্যন্ত প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর আদেশে দৈহিক ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জন করে।

উত্তরঃ (২) রমজানে মুসলমানদের করণীয় ও বর্জনীয়-

রমজান মাসে মুসলমানরা ফজরের ওয়াক্তের শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, ও স্বামী-স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকে, পুরো মাস এ নিয়মে চলতে হয়। এ মাসে সূর্যাস্তের পর থেকে পরদিন ফজরের আগ পর্যন্ত সময়ে পানাহার ও স্বামী- স্ত্রী মিলনে নিষেধ নেই। অবশ্য এ সময় ভূরিভোজ

নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এই রোজার মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ আসে।

উত্তরঃ (৩) বিভিন্ন বছর বিভিন্ন সময়ে রোজা হয় কেন?

রমজান ইসলামী ক্যালেন্ডারের একটি মাস যা চন্দ্র বছর। চন্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ৯ থেকে ১০দিন কম হয়। এজন্যে প্রতি বছর রমজান মাস পূর্বের বছরের চেয়ে ১০-১১ দিন আগে আসে। এতে সুবিধা এই যে মুসলমানরা সব ঋতুতেই রোজার অভিজ্ঞতা লাভ করে।

উত্তরঃ (৪) মেরু দেশের মুসলমানরা কিভাবে রোজা রাখবে-

ইসলামী আইন সব দেশের সব যুগের জন্য সহজসাধ্য করে তৈরী করা হয়েছে। মুসলিম আইনবিদরা বলেন যেসব দেশে মাসের পর মাস সূর্য দেখা যায় না বা মাসের পর মাস রাত থাকে সেখানকার মুসলমানরা নীচের যে কোন একটি ব্যবস্থা নেবে;

(ক) সেই দেশের নিকটবর্তী যে দেশে দিন-রাত যথা নিয়মে হয় সেখানকার সময় অনুসারে তারা রোজা করবে।

(খ) মক্কার সেহেরী ইফতারের সময় মত রোজা করবে।

উত্তরঃ (৫) শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে রোজার বিধান-

বয়ঃপ্রাপ্ত বালেগ সকল মুসলমানের জন্য রোজা ফরজ। এটা বাঞ্ছনীয় যে শিশুদের মাঝে ছোটবেলা থেকেই রোজার অভ্যাস গড়ে তোলা। কারণ এতে তাদের মাঝে রোজার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মাবে। তবে তাদের এ কাজে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। সাধারণতঃ মুসলমান শিশুরা বড়দের সাথে উঠে সেহেরী খেতে ও রোজা রাখতে খুব উৎসাহ বোধ করে। এজন্য অনেক মা-বাবা শিশুদের সেহেরী খাওয়ায় এবং সংক্ষিপ্ত রোজা শেষে দুপুরেই ইফতার (!) করিয়ে দেয়। এটা এক্ষেত্রে ভাল যে এভাবে ধীরে ধীরে বাচ্চাদের মধ্যে রোজার অভ্যাস জন্মে।

উত্তরঃ (৬) যাদের জন্য রোজা মাফ-

কয়েকটি ক্ষেত্রে রোজা থেকে সাময়িক বা পূর্ণ অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যথাঃ

(ক) যে সব অসুস্থ মানুষ রোজা রাখলে রোগ বাড়বে তাদের সাময়িকভাবে রোজা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পরে তাদের কাযা রোজা করতে হবে।

(খ) যেসব ক্রনিক রোগী বর্তমানে রোজা রাখতে পারছে না এবং ভবিষ্যতেও তাদের পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব হবে না, এমন রোগীদের রোজা থেকে স্থায়ী অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তারা এক্ষেত্রে একজন গরীব অভুক্ত রোজাদারকে পুরো রোজার মাস খেতে দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবে।

(গ) মেয়েদের মাসিক ঋতুর সময় এবং সন্তান জন্মাবার পর নেফাস অবস্থায় রোজা থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া গর্ভবতী ও স্তনদানকারী মায়েদেরও একই ধরনের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

উত্তরঃ (৭) রোজার ব্যাপারে ভীতু যারা-

রোজা নিয়ে অমুসলিম পশ্চিমা সমাজে অহেতুক কিছু ভীতি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে রোজা রাখে তার জন্য এটা কোন কষ্টকর কিছু নয়। প্রথম দু-চারটি রোজা একটু একটু কষ্ট হলেও এরপর শরীর এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে শেষের দিকে রোজায় আর অসুবিধা হয় না। বিশেষতঃ যদি ছোটবেলায় অভ্যাস করা হয়।

উত্তরঃ (৮) রমজানে মুসলিম দেশে কি জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে-

এ বিষয়েও পাশ্চাত্যে ভুল ধারণা আছে। এটা অনেকে মনে করে যে রোজার মাসে মুসলিম দেশে কাজ-কর্ম ব্যবসা বাণিজ্য সব স্থবির হয়ে যায়। এ ধারণা মোটেই ঠিক না। রোজার কারণে ক্লান্তি থেকে মানুষের কাজের গতি একটু হ্রাস পেতে পারে কিন্তু তা বড় কোন ব্যত্যয় ঘটায় না। অধিকাংশ দেশে রোজায় অফিস সময়সূচী পরিবর্তন করা হয়। সুবিধাজনক সময়সূচীতে রোজাদাররা স্বাভাবিকভাবেই কাজ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিংও আগের গতিতেই চলে। সঙ্গত কারণেই দিনের বেলা রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা কম হয়। কিন্তু অন্যদিকে ইফতার ও সেহেরীর সময় তারা ব্যবসা করে পুষিয়ে নিতে পারে।

উত্তরঃ (৯) ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে রোজার গুরুত্ব-

আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের এক অনুপম উদাহরণ রোজা। মানুষের জীবনকে আল্লাহর আদেশে পরিচালিত করা উত্তম পন্থা। মানুষ তার বৈধ অধিকার ও চাহিদাগুলোকেও শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশে দমিয়ে রাখে। এটা তার মধ্যে সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। যা তাকে অনৈতিক সকল লোভকে জয় করার সাহস ও শক্তি দেয়। রোজার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে নিজের ভুল ও পাপসমূহ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার সুযোগ পায়। এটা অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এক জেহাদ। রাসুল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রোজা রেখেও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকল না, তার না খেয়ে থাকার প্রতিদান দেবার কোন প্রয়োজন আল্লাহর নাই।

উত্তরঃ (১০) রোজার পর-

রোজা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়। এটা একটি সামাজিক ইবাদাত। রোজায় ক্ষুধার অভিজ্ঞতা লাভ করে মুসলমানরা গরীব ও দরিদ্র মানুষের কষ্ট বুঝতে পারে। তারা আরও দানশীল হয়। রমজান মাসেই সাধারণতঃ মানুষ যাকাত বিতরণ করে। রমজান শেষে মানুষ খুব সকালে উঠে। উত্তম পোশাক পরে আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে ঈদের জামায়াতে যায়। ঈদের জামায়াতে বিশেষ বক্তব্য (খুৎবা) রাখা হয়। নামাজের পর মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ, মোলাকাত করে। আত্মীয় বান্ধবের বাড়ীতে যায়। নিজেদের মধ্যে উপহার ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ২ঃ১৮৫-১৮৬

ই- ৯ পঞ্চম স্তম্ভ– হজ্ব

প্রশ্ন- (১) হজ্ব অর্থ কি?

প্রশ্ন- (২) অমুসলিমরা বলে যে হজ্ব মানে শুধু রাসুল (সাঃ)-এর রওজা মুবারাক জিয়ারত- এটা কি সত্যি?

প্রশ্ন- (৩) হজ্ব মানে কি শুধু পবিত্র জায়গাগুলো দর্শন নাকি এর গভীর অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে?

প্রশ্ন- (৪) হজ্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং মুসলমানদের স্যাথে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্পর্ক কি?

প্রশ্ন- (৫) ইব্রাহীম (আঃ) কিভাবে আরবে এসে বসত গড়েন?

প্রশ্ন- (৬) ইসমাইল (আঃ)-এর নির্বাসন ও বসতের ঘটনা বাইবেলে কিভাবে এসেছে?

উত্তরঃ (১) হজ্ব অর্থ-

বছরে নির্দিষ্ট সময় মক্কা ও তার আশেপাশের পবিত্র স্থানসমূহে গমন, নির্দিষ্ট ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের নাম হজ্ব। এটা এমন এক ইবাদাত যাতে শরীর, মন ও আত্মা সব একসাথে অংশ নেয়। হজ্ব ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিম নারী পুরুষের জন্য জীবনে একবার হজ্ব ফরজ। হজ্ব-এর সামর্থ্যের জন্য বড় ধনী হবার প্রয়োজন নেই। মক্কা পর্যন্ত ভ্রমণের এবং থাকা খাওয়ার পর্যাপ্ত অর্থ ও ঐ সময়ে পরিবারের ভরণপোষণ থাকলেই বুঝতে হবে হজ্বের সামর্থ্য আছে। জীবনে সুস্থ সবল থাকতে হজ্ব করতে রাসুল (সাঃ) উৎসাহিত করেছেন। কারণ এর আনুষ্ঠানিকতা রুগ্ন ও বৃদ্ধ অবস্থায় পালন কষ্টকর।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে হজ্ব পালন করে তার পুরো জীবনের সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

উত্তরঃ (২) রাসুল (সাঃ)-এর রওজা মুবারাক জিয়ারত ও হজ্ব-

কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যাতে রাসুল (সাঃ)-এর রওজা জিয়ারতকে হজ্বের অংশ বলা হয়েছে। এমনকি রাসুল (সাঃ) নিজেও তাঁর কবর জিয়ারত হজ্বের অন্তর্ভুক্ত বলেননি। হজ্বের সব আনুষ্ঠানিকতাই মক্কা এবং তার আশে পাশে পালন করতে হয়। মদিনা মক্কা থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে। কাজেই রাসুল (সাঃ)-এর মাজার জিয়ারতকে হজ্বের অংশ বলা ভুল। তবে যে কোন মুসলমানই মক্কা বা আরবে গেলে রাসুল (সাঃ)-এর রওজা জিয়ারত করেন। কিন্তু হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা মক্কাতেই শেষ হয়। হজ্বের উদ্দেশ্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা।

উত্তরঃ (৩) হজ্বের উদ্দেশ্য ও গভীর অর্থ-

হজ্ব শুধুমাত্র পবিত্র স্থানে গমন নয়। ভ্রমণের চাইতে অনেক গভীর এর তাৎপর্য। হজ্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এটা যে শুধু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় থেকে চালু তা নয়। এটা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় থেকে চালু। এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও হজ্বের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য আছে। যথা–

(ক) এটা মুসলমানদের আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত ও অনুগত হতে শিক্ষা দেয়।

(খ) এটা মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মিশন স্মরণ করিয়ে দেয়।
(গ) এটা মানুষকে তার মৃত্যু, পুনরুত্থান ও জবাবদিহিতার কথা মনে করিয়ে দেয়।
(ঘ) এটা সারা দুনিয়ার মুসলমানের ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করে। হজ্বে সবার পরনে এক পোষাক থাকে। ফলে গোত্র, বর্ণ, অর্থ-বিত্ত ইত্যাদির ভেদ দূর হয়ে যায়।
(ঙ) এটা মুসলিম বিশ্বের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মত। যেখানে নিজেদের মতামত ও ভালবাসা বিনিময় করা যায়।

উত্তরঃ (৪) হজ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও ইব্রাহীম (আঃ)-

কুরআনে ইব্রাহীম (আঃ)কে পাঁচ জন প্রধান নবীর একজন বলা হয়েছে। তাঁর বংশধারায় নবুওয়ত দেবার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর ছেলে ইসহাক (আঃ)-এর বংশে বনী ইসরাইলী নবীরা আসেন। ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) কাবাগৃহ তৈরী ও মক্কার আবাদ করেন। তাওহীদবাদ প্রতিষ্ঠায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এজন্য তাঁকে তাওহীদবাদীদের (মুসলিম) জাতির পিতা বলা হয়।

উত্তরঃ (৫) বাইবেল ও কুরআনে ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাহিনী-

বাইবেল ও কুরআনে বর্ণিত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাহিনীতে মিল আছে। জেনেসিস-১২ তে উল্লেখিত আছে যে, আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ)কে তাঁর বংশে নবী দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি তাঁর দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে দেয়া হয়। জেনেসিস-এর ১৬ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে সারাহ (রাঃ) বন্ধ্যা হওয়ার তাঁর দাসী হাজেরাকে (রাঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে বিয়ে দেন। তাঁর গর্ভেই ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রথম পুত্র সন্তান ইসমাইল (আঃ) জন্ম নেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ কর্তৃক ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশে অনেককে নবী বানাবার প্রতিশ্রুতি আবার দেয়া হয়। এরও পর সারাহ (রাঃ) গর্ভবতী হন এবং ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম দেন। তাঁর বংশে সকল ইসরাইলী নবীরা আসেন। বাইবেল বলে যে ইসমাইল (আঃ) আরবে (পারান বা ফারান) বসত গড়েন। তাঁর ১২ ছেলের বড় জনের নাম কেদার। বাইবেল যদিও কেদার-এর বংশে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম বলেনি তবুও এটা স্পষ্ট করে বলেছে যে ইসরাইলীদের ভ্রাতৃবংশে নবী আসবেন। ক্রটিপূর্ণ অনুবাদ, ভুল বুঝাবুঝি ও পক্ষপাতিত্বের কারণে মানুষ ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরদের খাটো বলে মনে করে। অবশ্যই আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশের কোন এক পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না।

উত্তরঃ (৬) ইসমাইল (আঃ) যেভাবে আরবে এলেন-

ইসলাম মতে ইব্রাহীম (আঃ) যখন খুব ছোট তখন আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ)কে আদেশ করেন হাজেরা (রাঃ)কে পুত্রসহ আরবে (পারান) নির্বাসন দিতে যেখানে কোন বসতি ছিলনা। পুত্র যখন পানির অভাবে কান্নাকাটি করছিল তখন হাজেরা (রাঃ) সাফা হতে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত পানির জন্য ছুটাছুটি করেন। সেখানে পানি না পেয়ে বাচ্চার কাছে এসে দেখেন যে ক্রন্দনরত বাচ্চার পায়ের গোড়ালীর আঘাতে মাটি ভেদ করে পানি আসছে। এই পানি ঝরণা ধারার মত নিরন্তর নির্গত হচ্ছে। যা জমজম কুপ হিসেবে আজও বিদ্যমান। জমজম কুপের মাধ্যমে পানি আসায় তার চারিদিকে দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠে যার নাম মক্কা।

উত্তরঃ (৭) ইসমাইল (আঃ) ও হাজেরা (রাঃ) সম্পর্কে বাইবেল-

কুরআন ও বাইবেল দুখানেই হাজেরা (রাঃ)-এর নির্বাসনের উল্লেখ আছে। তবে বর্ণনায় যেসব পার্থক্য আছে তা নিম্নরূপ–

নির্বাসনের কারণ ঃ বাইবেল বলেছে যে সারাহ (রাঃ) হিংসায় কাতর হয়ে ইব্রাহীম (আঃ)কে তাঁদের নির্বাসন দিতে বাধ্য করেন। কুরআন বলে এটা ছিল আল্লাহর আদেশ।

নির্বাসনের স্থান ঃ বাইবেল বলে, নির্বাসনের স্থান ছিল বিরসেবা (Beer Sheba)। যা প্যালেস্টাইনে অবস্থিত। কুরআন বলে যে এটা ছিল আরব এবং মক্কা। কুরআনের বর্ণনার পক্ষে ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায়।

যে সময়ে নির্বাসন হয়েছিল ঃ জেনেসিস বলে, ইসমাইল (আঃ)-এর জন্মের পর নির্বাসন হয়েছিল। কিন্তু একখানে বলা হয়েছে তিনি তখন এত ছোট ছিলেন যে মায়ের কাঁধে করে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে নির্বাসনের সময় ইসমাইল (আঃ)-এর বয়স ছিল ১৫ বছর। বাইবেলের বর্ণনায় এসব অসঙ্গতি Interpreters Dictionary of Bible-এস্বীকার করা হয়েছে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (১) আল কুরআন ৩ঃ৯৭, ২ঃ১৯৬

প্রশ্ন- (৬) (৭) আল কুরআন ১৪ঃ৩৭

Interpreters Dictionary of Bible দেখুন

প্রশ্ন- (১) ইব্রাহীম (আঃ) যে তাঁর নির্বাসিত পরিবারকে দেখতে যেতেন তার প্রমাণ আছে কি?

প্রশ্ন- (২) ইসহাক (আঃ)কে নয় বরং ইসমাইল (আঃ)কে যে কুরবানী দেয়া হয় তার প্রমাণ কুরআনে আছে কি?

প্রশ্ন- (৩) দয়াময় আল্লাহ কেন ইব্রাহীম (আঃ)কে তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তানকে কুরবানী করার আদেশ দিলেন?

প্রশ্ন- (৪) কুরবানীর ব্যাপারে বাইবেলের চেয়ে কুরআনের বর্ণনা কেন গ্রহণযোগ্য? (যেখানে বলা হয়েছে যে ইসমাইলকে নয় বরং ইসহাককেই কুরবানী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল)

উত্তরঃ (১) ইব্রাহীম (আঃ) যে তাঁর পরিবারকে দেখতে যেতেন তার প্রমাণ-

কুরআনে দুটি উদ্ধৃতি আছে যাতে বোঝা যায় ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর নির্বাসিত পরিবারকে দেখতে অন্ততঃ দুবার মক্কা গিয়েছেন। প্রথম ঘটনায় (২ঃ১২৭-১২৯) দেখা যায় ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ) একসাথে কাজ করে এক আল্লাহর প্রথম ইবাদাতগাহ 'কাবা ঘর' নির্মাণ করেন। তাঁরা দুইজন এই আল্লাহর ঘরের জন্য দোয়া করেন। সেই শহরের জন্য দোয়া করেন। তাঁদের দোয়ার ফলশ্রুতিতেই ঐ শহর থেকে শেষ নবী (সাঃ)-র আবির্ভাব। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে ইসমাইল (আঃ)কে কুরবানীর ঘটনা (৩৭ঃ৯৯-১১৩)। যেখানে দেখা যায় ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বপ্নে আল্লাহ তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ)কে কুরবানী দিতে আদেশ করলেন। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে সপ্নাদেশের কথা বললে তিনি আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে সানন্দে রাজী হয়ে যান। ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে নিয়ে কুরবানী করতে মিনা নামক স্থানে যান। পথে শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাইল (আঃ)কে কুরবানী করতে উদ্যত হন। সেই সময় আল্লাহর ফেরেশতা একটি দুম্বা নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বলেন যে আল্লাহ তাঁর ত্যাগের ইচ্ছা কবুল করেছেন। পুত্রের বদলে দুম্বা কুরবানী দিতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। ইব্রাহীম (আঃ)তখন আল্লাহর আদেশ পালন করেন। এ ঘটনার স্মরণে এখনও হাজীরা মিনায় পশু কুরবানী দেন।

উত্তরঃ (২) ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবানী হবার প্রমাণ-

কুরআন থেকে এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসহাক নয় বরং ইসমাইল (আঃ)কেই কুরবানী দিতে নেয়া হয়েছিল। কুরআনে বলা হয়েছে (৩৭ঃ১১৩) যে কুরবানীর সময় ইসমাইল (আঃ) ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর একমাত্র পুত্র। কুরআনে কুরবানীর ঘটনার বর্ণনার পর কুরআন ইব্রাহীম (আঃ)-এর আর একটি পুত্র সংবাদ লাভের সংবাদ দেয়। কাজেই নিঃসন্দেহে ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবানীর ঘটনার পর ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম।

উত্তরঃ (৩) দয়াময় আল্লাহ কেন প্রিয় পুত্রকে কুরবানীর আদেশ দিলেন-

আল্লাহর এই আদেশ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যথা–

(ক) এটা আল্লাহর আদেশকে মানুষের আবেগ, যুক্তি ও মানবীয় জ্ঞানের উর্দ্ধে কিভাবে স্থান দিতে হয় তাই মানুষকে শেখায়।
(খ) কুরবানীর আদেশ ছিল ইব্রাহীম (আঃ)-এর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের গভীরতার পরীক্ষা।
(গ) ইব্রাহীম (আঃ)কে গোটা জীবনে অসংখ্য কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তাঁর মধ্যে এটা ছিল আরও কঠিন পরীক্ষা। জীবন সায়াহ্নের এই পরীক্ষায় তিনি দূর্বলতার পরিচয় দিতে পারতেন। কিন্তু এখানেও তিনি ধৈর্য্যের সাথে আল্লাহর আদেশ পালনে অটল থাকেন।
(ঘ) ফেরেশতা এসে কুরবানীর জন্য দুম্বা দেয়া থেকে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে কোন সময়েই মানুষকে কুরবানী দেয়া যাবে না। (অনেক ধর্মে নরবলী চালু আছে) আল্লাহ রক্তপাতে আনন্দ পান না বরং মানুষের সততা খোদাভীতি প্রশ্নাতিত আনুগত্যেই সন্তুষ্ট হন। এজন্যই হজ্বে ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্মরণে হাজীরা কুরবানী করেন। এর গোশত গরীবদের মাঝে বন্টন করা উচিত।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর চূড়ান্ত ত্যাগের স্পৃহা গোটা মানবজাতির জন্য আদর্শ। একজন পিতা তাঁর একমাত্র আদরের পুত্র সন্তানকে শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশে কুরবানী করতে এগিয়ে যাচ্ছে কি অপরূপ দৃশ্য। কাজেই মুসলমানরা দুনিয়ার কোন কিছুকেই আল্লাহর চেয়ে যেন বেশী ভাল না বাসে। তারা সব সময় তাদের অর্থ, শক্তি, সময়, সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

উত্তরঃ (৪) ইসমাইল (আঃ)-এর ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনাই সঠিক-

ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র কুরবানীর ঘটনা বর্ণনায় বাইবেলে অনেক স্ববিরোধিতা ও ভুল আছে। বাইলেবের বহু জায়াগায় ইসমাইল (আঃ)-এর নাম ঢালাওভাবে মুছে তাঁর জায়াগায় ইসহাক (আঃ)-এর নাম লেখার রীতি দেখা যায়। জেনিসিস-এর এক জায়গায় লিখা হয়েছে যে ইসমাইল (আঃ) ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রথম পুত্র। তাঁর জন্মের পর ১৪ বছর ইব্রাহীম (আঃ)-এর কোন সন্তান হয়নি। এ সময়ের মধ্যে কুরবানীর ঘটনা হয়। অথচ এই জেনেসিসেই আরেক জায়গায় লিখেছে ইসহাক (আঃ)কে কুরবানী করা হয়। যদিও কুরবানীর সময় তাঁর জন্মই হয়নি। কোন কোন বাইবেল বিশেষজ্ঞ এই অভিযোগ খন্ডনে এটা বলতে চান যে, ইসমাইল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর বৈধ সন্তান ছিলেন না। কিন্তু জেনেসিসেই অকাট্যভাবে দেখা যায় যে, স্বয়ং সারাহ (রাঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে হাজেরা (রাঃ)কে বিয়ে দেন।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন- (২) আল কুরআন ২ঃ১২৭-১২৯, ৩৭ঃ৯৯-১১৩

ই- ১১ হজ্ব ঃ আনুষ্ঠানিকতাসমূহ ও গুরুত্ব

প্রশ্ন- (১) প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে কয়েক মিলিয়ন মুসলমান মক্কায় হজ্ব করতে যায় এর কারণ কি?
প্রশ্ন- (২) হজ্ব কয় প্রকার এবং কোন কোন সময় হজ্ব করতে হয়?
প্রশ্ন- (৩) কোন স্থানে হজ্ব যাত্রীদের ইহরাম বাঁধতে হয়?
প্রশ্ন- (৪) ইহরাম বাঁধার নিয়ম কি?
প্রশ্ন- (৫) মেয়েরাও কি ইহরামে একই পোশাক পড়ে?
প্রশ্ন- (৬) ইহরামের কাপড়ের তাৎপর্য কি?
প্রশ্ন- (৭) নির্দিষ্ট কাপড় পরা ছাড়া ইহরামে আর কি কি করতে হয়?
প্রশ্ন- (৮) ইহরাম বেঁধে কাবা যেতে যেতে কি বলতে হয়?
প্রশ্ন- (৯) কাবা শরীফের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন- (১০) কাবা শরীফে পৌঁছবার পর হজ্ব যাত্রীকে কি করতে হয়?
প্রশ্ন- (১১) কাবা তাওয়াফের গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ (১) লক্ষ লক্ষ মানুষের হজ্ব যাত্রার কারণ ও গুরুত্ব-

প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন মানুষ হজ্ব করতে আরবে যায়। এই কাজের মাধ্যমে ইব্রাহীম (আঃ)কে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে মানুষ দলে দলে পবিত্র স্থান মক্কায় ধাবিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে মানুষের যাত্রা আল্লাহর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। সাথে সাথে এটা আল্লাহর পথে ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিরন্তন ভ্রমণের প্রতি একাত্মতা ঘোষণাও বটে। মুসলমানরা এভাবে তাদের জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এই ভ্রমণ মানুষকে এটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে জীবনটাও একটি ভ্রমণের মত যার একটি লক্ষ্য আছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন ও জবাবদিহি।

উত্তরঃ (২) হজ্বের সময় ও প্রকারভেদ-

হজ্ব দুই প্রকার যথা–

(ক) **উমরা হজ্ব–** এটা বছরের যে কোন সময় করা যায়। তবে এর মাধ্যমে ফরজ হজ্বের চাহিদা পূরণ হয় না।

(খ) **হজ্ব–** এটা হচ্ছে প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ। এর আনুষ্ঠানিকতাগুলো জেলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখের মাঝে করতে হয়। জিলহজ্ব মাস ইসলামী ক্যালেণ্ডারের দ্বাদশ মাস।

উত্তরঃ (৩) ইহরাম-

ইহরাম মানে আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্বের প্রস্তুতি নেয়া। ইহরাম হজ্বের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ (ফরজ)। বাড়ী থেকে বের হয়েই ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই।

কাবা শরীফ থেকে কয়েকশ কিলোমিটার দূরে মিকাতের (ইহ্‌রাম বাঁধার সর্বশেষ সীমা) কাছে উপনীত হলেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। অধুনা বিমান যাত্রীরা অবশ্য বিমানে উঠবার সময় ইহ্‌রাম বেঁধে উঠেন।

উত্তরঃ (৪) ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম-

ইহ্‌রাম বাঁধার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে হজ্বের নিয়ত করা, যা অন্তর থেকেই আসতে হবে। শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালন করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যই হজ্ব করা হচ্ছে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মনে করতে হবে। এ ছাড়াও ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে যা করতে হবে তা হচ্ছে–

(ক) গোসল করা।

(খ) পুরুষরা তাদের অন্য সব কাপড় বর্জন করে দুই টুকরা সেলাইবিহীন কাপড়ে শরীর আবৃত করবে। একটি কাপড় কোমড়ে বাঁধবে। আর একটি বুকে জড়াবে। ডান কাঁধ অনাবৃত রেখে বাম কাঁধ আবৃত করবে। জুতা বাদ দিয়ে স্যান্ডেল পড়তে হবে। মাথা উন্মুক্ত রাখতে হবে।

উত্তরঃ (৫) মেয়েদের ইহ্‌রামের পোশাক-

শালীনতার জন্য মেয়েদের ইহ্‌রামে পুরুষের মত পোষাক পড়তে হয় না। তারা যে কোন শালীন পোশাক যাতে নারীর সৌন্দর্য বা সম্পদ চোখে পড়ে না তা পড়তে পারবে। তবে তাদের হাত ও মুখ উন্মুখ রাখতে হবে। সাদা পোশাক পরাই উত্তম।

উত্তরঃ (৬) ইহ্‌রামের কাপড়ের তাৎপর্য-

পোশাক মানুষের সম্পদ, অহঙ্কার, ক্ষমতা ও দম্ভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যিনি হজ্বের মত আল্লাহর অতি পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সর্বোচ্চ ইবাদাতে যাচ্ছেন তাকে সমস্ত গর্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করতে হবে। সকল মুসলিম ভাইয়ের সাথে একই রকম পোশাক পড়ে সমতা কায়েম করতে হবে।

উত্তরঃ (৭) ইহ্‌রাম অবস্থায় পালনীয়-

নির্দিষ্ট পোশাক পড়া ছাড়াও ইহ্‌রাম অবস্থায় যা করতে হবে তা হচ্ছে–

(ক) সকল ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

(খ) কথা বা কাজে কোন অশালীনতা করা যাবে না।

(গ) কোন পশু প্রাণী শিকার বা হত্যা করা যাবে না। আল্লাহ সৃষ্ট সকল প্রাণীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে হবে। (শুধুমাত্র কোন প্রাণী বা পোকা কারো জীবন বিপন্ন করলে তা মারা যাবে)।

(ঘ) গাছ থেকে কোন ডাল-পালাও কাটা যাবে না।

(ঙ) চুল, নখ কাটা যাবে না।

(চ) স্বামী-স্ত্রী দৈহিকভাবে মিলিত হতে পারবে না।
লক্ষ্য হচ্ছে সব পার্থিব আনন্দ ভুলে যেতে হবে।

উত্তরঃ (৮) ইহরাম বেঁধে কাবায় যেতে যেতে যা বলতে হয়-

ইহ্‌রাম বাঁধার পর মক্কা যেতে যেতে হাজীরা উচ্চস্বরে বার বার বলবে–

"লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক
লাব্বায়েক লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক
ইন্নাল হামদা ওয়া নিয়মাতা লাকা ওয়ালমুলক
লা শারীকা লাকা।"

অর্থ– "হে প্রভু আমি আপনার জন্য উপস্থিত। আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নেই। আমি উপস্থিত, সকল প্রশংসা নেয়ামত ও সার্বভৌমত্ব আপনার। আপনার কোন শরীক নেই।"

উত্তরঃ (৯) কাবা শরীফ-

কাবা একটি বর্গাকৃতি ঘর। যা কালো গিলাফে আচ্ছাদিত থাকে। গিলাফ কোন আবশ্যক কিছু না। তবে আচ্ছাদিত রাখা উত্তম। কাবার একটি দরজা আছে। এর ভেতর কোন ছবি, মূর্তি এমনকি কোন লেখা কিছুই নেই। এই ঘরের সরলতা সত্ত্বেও মানুষ এর দর্শন পেয়ে মহান প্রশান্তি আবেগ ও উৎসাহ বোধ করে। কারণ এটাই এক আল্লাহর উপাসনার জন্য পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর। এখানে এসে হাজীরা মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে একাত্মতা বোধ করেন।

উত্তরঃ (১০) কাবা শরীফে পৌঁছার পরের আনুষ্ঠানিকতা-

কাবায় পৌঁছবার পর হাজীরা কাবাকে বাঁদিকে রেখে তাকে কমপক্ষে সাতবার বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করবে। এর নাম 'তাওয়াফ' প্রত্যেকে এক দিকেই ঘুরবে এবং এক জায়গা থেকে ঘোরা শুরু করবে। যে জায়গা থেকে ঘোরা শুরু করা হয় সেখানে একটি কালো পাথর আছে যার নাম 'হযরে আসওয়াদ'। হাজীরা কাবার চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে আল্লাহর করুণা, সমর্থন, প্রেরণা ও আখেরাতে মুক্তি চেয়ে দোয়া করে।

উত্তরঃ (১১) কাবার চারিদিকে প্রদক্ষিণের গুরুত্ব-

হজ্বের সব আনুষ্ঠানিকতা আল্লাহর আদেশের এবং রাসুলের নির্দেশনা অনুসারে পালন করা হয়। অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী নওমুসলিম মুহম্মদ আসাদ তাওয়াফ সম্পর্কে সুন্দর উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটম এর নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলো যেভাবে ঘুরে, সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলো, গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহ যেভাবে ঘুরে তেমনি আল্লাহর ঘরের চারিদিকে মুসলমানরা ঘুরে। মুসলমানদের জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে আল্লাহর উপাসনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

ই- ১২ হজ্ব ঃ আনুষ্ঠানিকতাসমূহ ও গুরুত্ব-২

প্রশ্ন- (১) কালো পাথর (হযরে আসওয়াদ) কি? এর গুরুত্ব কি?

প্রশ্ন- (২) কাবা তাওয়াফ করার পরে কি করতে হয়?

প্রশ্ন- (৩) সাফা মারওয়ায় ছুটাছুটি করতে হয় কেন?

প্রশ্ন- (৪) হজ্বে কি প্রাক-ইসলামী যুগের পৌত্তলিকদের পালন করা নিয়ম চর্চা করা হয়?

প্রশ্ন- (৫) আরাফাতের ময়দানের কাজ কি?

প্রশ্ন- (৬) আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করার পর আর কি কাজ থাকে?

উত্তরঃ (১) কাল পাথর (হযরে আসওয়াদ)-

কালো পাথর (হযরে আসওয়াদ) হচ্ছে একটি ছোট পাথরের টুকরো যা কাবার এক কোণায় অবস্থিত। এর উৎস নিয়ে কয়েকটি ধারণা বিদ্যমান। কারো কারো মতে এটা তিন হাজার বছর আগে ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক কাবা নির্মাণের সময় একজন ফেরেস্তা এর ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে তাঁর কাছে বয়ে এনেছিলেন।

মূল ঘটনা যাই হোক না কেন কালো পাথর প্রথম নির্মিত কাবা গৃহেরই অন্যতম দেয়ালের একটি টুকরো। প্রকাশ থাকে যে, কাবা গৃহ বেশ কয়েকবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। কালো পাথরকে কোন ভাবেই মূর্তি বা প্রতিমার সাথে তুলনা করা যায়না। হজ্ব বা উমরার সময় মুসলমানরা ভক্তি ভরে এ পাথরে চুমো খায় এটা কোন উপাসনা বা পূজা নয়।

এই পাথরের সংস্পর্শ লাভের সাথে মুসলমানরা তাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে একাত্মতাবোধ করে। মানুষ যেমন আদরের বসে তার সন্তানকে চুমো খায় তেমনি মুসলমানরা হযরে আসওয়াদকে চুমো দেয়। এটাকে যে মুসলমানরা পুজা করেনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা এই পাথরকে চুমো খেতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি জানি তুমি একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নও। আমার কোন কল্যাণ বা ক্ষতি করার সামর্থ্য তোমার নেই। যদি আমি মুহাম্মদ (সাঃ)কে তোমাকে চুমো খেতে না দেখতাম তবে আমি তোমাকে স্পর্শও করতাম না।" কাবা প্রদক্ষিণের সময় হাজীরা বলে বিসমিল্লাহি আল্লাহ্ আকবার (আল্লাহ্র নামে এবং আল্লাহ মহান)-এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীকানকে অস্বীকার করে।

উত্তরঃ (২) কাবা প্রদক্ষিণের পরের আনুষ্ঠানিকতা-

কাবা প্রদক্ষিণের পর মুসলমানরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিদর্শন দেখতে যায়। এটি হচ্ছে মোকামে ইব্রাহীম। কাঁচ আবৃত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন। সম্ভবত কাবা গৃহ নির্মাণের সময় তাঁর এই পদচিহ্ন পড়েছিল। মোকামে ইব্রাহীম পরিদর্শনের মাধ্যমে হাজীরা ইব্রাহীম (আঃ)কে স্মরণ করে; যিনি তাঁর নিজের জন্য নয় আল্লাহর প্রেমে এই ঘর বানিয়েছেন। এর পর হাজীরা সিকি মাইল দূরে সাফা মারওয়া নামক দুটো পাহাড়ের মধ্যে ৭ বার হাঁটা-হাঁটি করে।অক্ষম ব্যক্তিদের বহনের জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে। এই কাজ করার মাধ্যমে যারা উমরাহ করতে যায় তাদের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। তারা তখন ইহরাম খুলে এবং চুল কাটে।

অতঃপর তারা জমজম কূপে গিয়ে তার পানি পান করে এবং সেখানে ওজু করে। এটি হচ্ছে সেই কূপ যা শিশু ইসমাইল (আঃ)-এর পদাঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল।

উত্তরঃ (৩) সাফা-মারওয়ার ছুটাছুটির তাৎপর্য-

সাফা-মারওয়ায় ছুটাছুটি করে নির্বাসিতা হাজেরা (রাঃ)-এর কষ্টের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়। শিশু ইসমাইল (আঃ)-এর জন্য পানির সন্ধানে তিনি সাফা মারওয়ার মাঝে ৭ বার ছুটাছুটি করে ব্যর্থ হন। অতঃপর সন্তানের অবস্থা দেখতে এসে দেখেন যে তাঁর পায়ের গোড়ালীর আঘাতে মাটি ফেটে পানি বের হচ্ছে। সাফা-মারওয়ায় ছুটাছুটির মাধ্যমে মুসলমানরা আরও কয়েকটি বিষয় মনে করে–

(ক) যখন হাজেরা (রাঃ) জনমানবশূন্য নির্বাসনে গেলেন তখন তিনি হতাশভাবে নিশ্চেষ্ট বসে থাকেননি। ইসলাম কোন অবস্থাতেই হতাশ হতে বারণ করে।

(খ) হাজেরা (রাঃ)-এর আচরণে অনেক কিছু শেখার আছে। তিনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটলেন। তাঁর মনে দৃঢ় আশা ছিল যে আল্লাহর রহমতে পানি জুটবে। তাঁর কষ্ট দূর হবে।

(গ) রাসুলের পর দেড় হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ ঐ পথে দৌড়াদৌড়ি করে একাত্মতা ঘোষণা করছে একজন দুঃস্থ গরীব মহিলার সাথে। যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন দাসী (কোন কোন বর্ণনা মতে আফ্রিকান)। এ থেকে ইসলামের মহত্ব ও ঐতিহাসিক ভ্রাতৃত্ব ফুটে উঠছে। এখানে সাদা-কালো, জাতি-গোত্র, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ প্রভেদ নেই। সবাইকে হাজেরার (রাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হচ্ছে।

(ঘ) এর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারীর ও মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। প্রত্যেক হাজী একজন বিপদগ্রস্ত দরিদ্র মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

উত্তরঃ (৪) হজ্বে পৌত্তলিকদের অনুসৃত নিয়মের অনুসরণ প্রসঙ্গে-

পৌত্তলিকরা হজ্বে যেসব আনুষ্ঠানিকতা করত তার অনেক কিছুই তাদের তৈরী ছিল না। তাদের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইব্রাহীম (আঃ) অনুসৃত অনেক নিয়ম-কানুন ছিল। ইসলাম কাবাকে পুনরুদ্ধার করে হজ্বের আসল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে পৌত্তলিকদের অনুসৃত ইব্রাহীম (আঃ) প্রবর্তিত নিয়ম-কানুনের অনেকগুলোই ইসলামের হজ্ব বিধানে এসেছে। এটা পৌত্তলিকদের অনুসরণ নয় আসল নিয়মের বাস্তবায়ন। পৌত্তলিকরা এক আল্লাহর ইবাদতঘর কাবাকে অপবিত্র করেছিল আর ইসলাম সেই কাবাকে মূর্তিমুক্ত করে পবিত্র করেছে।

উত্তরঃ (৫) আরাফাত ময়দানে হজ্বের সমাবেশ-

সাফা-মারওয়ার আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর হাজীরা ৮ই জিলহজ্ব মিনা নামক স্থানে আসবেন। মিনা মক্কা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে। সেখানে তারা পরদিন জোহরের নামাজ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অতঃপর তারা আরাফাতের ময়দানে জমায়েত হবেন। আরাফাত এক বিশাল প্রান্তর। হজ্বের সময় সেখানে দাঁড়ানো সত্যিই এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। এখানকার জাবলুর রহমত থেকে রাসুল (সাঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় সব দেশের বিভিন্ন জাতির, ভাষার ও বর্ণের দুই মিলিয়নের বেশী মানুষ এখানে হজ্বের দিন জমায়েত হন। আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। এখানে দাঁড়িয়ে এই

অপরূপ সমাবেশ দেখে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মালিক শাবাজ (ম্যালকম এক্স) তাঁর বর্ণ বিষয়ক ধারণা ত্যাগ করেন। আরাফাতের জমায়েত মানুষকে মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাদের এভাবে হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে দাঁড়াবার কথা মনে করিয়ে দেয়।

উত্তর। (৬) আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করার পর করণীয়-

আরাফাত থেকে মুজদালিফা নামক জায়গায় যেতে হয়। সেখানে রাত্রি যাপনের পর ফজর নামাজ পড়ে তারা মিনায় ফিরে আসে। এখানে তারা শয়তানের প্রতিকরূপী তিনটি পাথরে পাথর নিক্ষেপ করে। এই স্থানেই শয়তান ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ)কে কুরবানী না দেবার কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল। এখানে হাজিরা চুল কাটে এবং কুরবানী দিয়ে ইহরাম মুক্ত হয়।

অতঃপর হাজীরা আবার কাবা তাওয়াফ করে এর নাম 'ইফাদা', যদিও এটি বাধ্যতামূলক নয়। এরপর হাতে সময় থাকলে হাজীরা মদিনায় গিয়ে রাসুলের রওজা মুবারাক জিয়ারত করে। এটা যদিও হজ্বের অংশ নয় তবু এটা করা বাঞ্ছনীয়।

হজ্ব শেষে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা ও জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবাই ঘরে ফিরে। রাসুল (সাঃ) বলেন সার্বিকভাবে হজ্ব সম্পাদনকারী নিষ্পাপ হয়ে (যেভাবে সে জন্মেছিল) ঘরে ফিরে।

'দি পাইওনিয়ার' – এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন, "ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরী ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হল না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীনের (ইসলাম) জ্ঞান লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার অধিবাসীদের সতর্ক করত, যেন তারা অনৈসলামিক নীতি পরিত্যাগ পূর্বক সঠিক নীতি অবলম্বন করতে পারে।" (সুরা তওবা, আয়াত-১২২)। রাসুল (স:) বলেছেন, "আল্লাহ্ যার মাধ্যমে কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন।" এ ছাড়া আরও অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যেগুলো ইসলামে জ্ঞান চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে। দুঃখজনক হলো এ সীমাহীন গুরুত্বের তুলনায় এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের প্রচেষ্টা অপর্যাপ্ত। ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যার বিপরীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে মানবতার সামনে সুস্পষ্ট করতে যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার সেটা দেয়া হচ্ছে না। অথচ ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি অনেকটা বর্তমান বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপর নির্ভর করে। এ প্রয়োজনের তাগিদেই মূলত" 'দি পাইওনিয়ার'–এর শুরু।

ইসলামের ওপর গভীর জ্ঞান অর্জন ও ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রসারের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে 'দি পাইওনিয়ার'–এ অন্তর্ভূক্ত কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্র যুবক কাজ করে যাচ্ছে। শুরুতে অল্প পরিসরে হলেও বর্তমানে 'দি পাইওনিয়ার' একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়েছে। সে সাথে বেড়েছে এর কর্মের পরিধি। এ মহান দায়িত্ব পালনে 'দি পাইওনিয়ার' মহান রাব্বুল আলামীনের তৌফিক কামনা করছে। আমীন!